বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।

"Life is short but Art is long."

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত

প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

বৈশাখ, ১৩০২।]   মূল্য ।০ চারি আনা।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ মল্লিক

মহাশয়েষু।

সাহিত্য-গুরু শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। আজ এক বৎসর অতীত হইল, তিনি আমাদিগকে কাঁদাইয়া অনন্তধামে গিয়াছেন! তাঁহার চির-অবসানে তাঁহার সোনার সিংহাসন আজি শূন্য পড়িয়া আছে। সেই শূন্য সিংহাসনের পানে চাহিয়া আজিও আমরা কাঁদিতেছি। আমাদের আশার আজিও তৃপ্তি হয় নাই, আমাদের সকল সাধ আজিও মিটে নাই।

কবি গিয়াছেন, কিন্তু কাব্য আছে। মহাকবি বঙ্কিমের সেই কাব্যগুলিকে আমরা কি

চক্ষে দেখি, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

মহাশয়, এই সন্দর্ভটী আজ আপনার নামে উৎসর্গ করিতেছি। আপনি গুণী, গুণগ্রাহী ও বঙ্কিমের একজন ভক্ত,—পূর্ব্বেই সে পরিচয় পাইয়াছি। আপনার সহিত আলাপে আরও মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি "স্বর্ণ-পদক" উপহার দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন —আর আজি আমি আপনাকে আমার এই হৃদয়ের "পদক" উপহার দিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, আপনি এ "পদকের" মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

মজিলপুর, }
২৪ পরগণা। }

বশংবদ
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

২৪১১

বঙ্কিম-জীবনী।

কবির জীবনী লেখা বড় শক্ত কাজ। কারণ, কবির জীবনী সাধারণ মানব-জীবন হইতে কিছু স্বতন্ত্র। তুমি আমি যেটাকে খুব গুরুতর একটা বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি, কবি হয়ত সেটাকে অতি সামান্য বা নগণ্য মনে করেন আবার তোমায় আমায় যে জিনিসটাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করি, কবি হয়ত সেই জিনিসটা'কেই হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে করেন। তোমার আমার সম্বল বহির্জগৎ,—বাহিরের খুটী-নাটী লইয়াই তোমায় আমায় দিন অতিবাহিত করি,—কিন্তু কবির লক্ষ্য অন্তর্জগৎ,—সেই জগতেই তিনি মগ্ন,—কাজেই সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার ঠিক খাপ খায় না। তাই বলিতেছিলাম, কবির জীবনী লেখা বড় শক্ত কাজ।

প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস, তাহাকেই আমি জীবনী বলি। মূল প্রবন্ধে, আমাদের বঙ্কিমের সেই হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যদি সে চেষ্টা সফল হইয়া থাকে, তবে চিন্তাশীল পাঠক সেই মূল প্রবন্ধেই বঙ্কিমের জীবনী দেখিতে পাইবেন। তবে "বঙ্কিম-জীবনী" ভূমিকা কাঁদিয়া এখন যাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা জীবনী নহে,—জীবনী-লেখকের কাহিনী মাত্র। অর্থাৎ বঙ্কিমের বংশাবলীর কিছু পরিচয়, বৈষয়িক কাজ কর্ম্মের কথা, পারিবারিক খুটী-নাটী ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও এরূপ "কাহিনী"র একটু প্রয়োজন আছে। অনেক সময়, গৃহ দেখিয়া "গৃহস্থ" কেমন, বুঝা যায়। বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে, 'বঙ্কিমের' গৃহ'ও একটু বুঝা ভাল। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাই অতি সংক্ষেপে আমরা বঙ্কিমের সেই 'গৃহটির' একটু পরিচয় দিব।

"সঞ্জীবনী-সুধা" নামক গ্রন্থে, ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী হইতে আমাদের বঙ্কিমের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কিছু পরিচয় পাই। স্বয়ং বঙ্কিমই সে জীবনী-লেখক। অগ্রজের সেই জীবনীতে তিনি লিখিতেছেন,—

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তর বাসী। * * * তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) কথিত

রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, পরমারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।”

এই যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র,—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। যাদবচন্দ্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ডেপুটী কলেক্টার নিযুক্ত হন। কর্ম্মোপলক্ষে চিরকালই তিনি বিদেশে থাকিতেন, এজন্য পুত্রগণকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এ-দেশ সে-দেশ করিয়া বেড়াইতে হইত, তাহাতে বালকদিগের লেখা-পড়ার কিছু ক্ষতি হইত।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ়, ইং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জুন, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমের জন্ম হয়। এই জীবনীর শেষভাগে তাঁহার জন্মপত্রিকার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দিলাম; জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে বঙ্কিমের ভাগ্যফল মিলাইয়া দেখিবেন।

শিশুকালে বঙ্কিম পিতার নিকটেই ছিলেন। তখন তাঁহার পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টার। সঞ্জীবের জীবনীতে বঙ্কিম নিজেই লিখিতেছেন,—

"কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। * * * আবার একজন "গুরুমহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন, কেন না আমাকে 'ক খ' শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।"

এই শৈশবেই মেধাবী বঙ্কিমের প্রতিভার পরিচয় পাই। 'হাতেখড়ির' দিন, এই গুরু-মহাশয়ের নিকট এক দিনেই তিনি সমস্ত

'বর্ণমালা' শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অবশ্য, পাঁচ বৎসর মাত্র। গুরুমহাশয় বঙ্কিমের এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশিষ্ট স্মরণশক্তির বড়ই প্রশংসা করিতেন।

১২৫২ সালে ৭ বৎসর বয়সে বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী স্কুলে নিযুক্ত হন। পিতা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরে;—সুতরাং এই মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলেই তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ। এখানেও বুদ্ধিমান বঙ্কিম নিজগুণে শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। প্রতি বর্ষেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একেবারে দুই শ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পাছে গুরু-পরিশ্রমে বালক বঙ্কিমের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শিক্ষকগণ তাঁহার 'ডবল প্রমোশন' বন্ধ করিয়া দিলেন।

১২৫৭ সালে যাদবচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। তখন বঙ্কিমের

বয়স ১১।১২ বৎসরের অধিক নয়। এই ১১।১২ বৎসর বয়সে বঙ্কিম সুবিখ্যাত হুগলী কলেজে নিযুক্ত হইয়া, কালে উক্ত কলেজের মুখোজ্জ্বল করেন। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী পাঠে তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিত না। কাজেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ যত হউক বা না হউক, বঙ্কিম লুকাইয়া, শিক্ষকদিগের অগোচরে, কলেজের লাইব্রেরী হইতে রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। অথচ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এরূপ ভাবে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেন যে, বৎসরান্তে পরীক্ষার সময়, তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার বা বৃত্তি পাইতেন। যথা সময়ে তিনি "সিনিয়র-স্কলারসিপ" পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এক ৺ দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র এ অবধি আর হুগলী কলেজে দৃষ্ট হয় নাই।

এই হুগলী কলেজে পাঠের সময় সংস্কৃত পড়িতে বঙ্কিমের একান্ত অভিলাষ হয়। তিনি প্রতিদিন কলেজ হইতে বাটী আসিয়া টোলে সংস্কৃত পাঠ করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ, রঘু, ভট্টি, মেঘদূত প্রভৃতি সাঙ্গ করিয়া চারি বৎসরের মধ্যেই একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

একাদশ বর্ষে বঙ্কিমের বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের ৮।৯ বৎসর পরে সে স্ত্রী পরলোক-গমন করেন। ১৯।২০ বৎসর বয়সে বঙ্কিম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন;—সে গুণবতী সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী "সূর্য্যমুখী" আজি পতি-শোকে কাতরা।

হুগলী কলেজে পাঠের সময় বঙ্কিম সুপ্রতিষ্ঠিত "সংবাদ প্রভাকর" ও "সুধীরঞ্জন" নামক সংবাদপত্রে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই দুই পত্রে প্রথিতনামা দীনবন্ধু মিত্র ও

কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী কবিতা লিখিতেন। সুতরাং কাব্য-যুদ্ধে জয়ী হইবার অভিলাষে, পাঠ্যাবস্থা হইতেই বঙ্কিম সাহিত্যের আসরে নামিলেন। এই যুদ্ধে তিনি দুই এক বার পরাজিত হন। কিন্তু তথাপি সেই সময় হইতেই তাঁহার লেখার একটু অপূর্ব্বত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু বা দ্বারকানাথের লেখায় সে গুণ ছিল না,—তাঁহারা গুরুর অনুকরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের বঙ্কিম, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য।

সাহিত্যে যেরূপ, গণিতশাস্ত্রেও বঙ্কিমের সেইরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের অধ্যয়ন কালে কলেজের অধ্যাপক একদিন ছাত্রদিগকে জ্যামিতির একটা কঠিন 'প্রতিজ্ঞা' পূরণ করিতে দেন। ক্লাসের কোন ছাত্র সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে সমর্থ হয়

নাই ,—অধ্যাপক সদুঃখে বলিযাছিলেন, "বঙ্কিম থাকিলে আজ আর আমায় এ প্রতিজ্ঞাটী তোমাদিগকে শিখাইতে হইত না।"

হুগলী কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইলে, ১২৬২ সালে আইন অধ্যয়নের জন্য বঙ্কিম কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন আইন পাঠও করিলেন। কিন্তু এই সময়, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে প্রথম বি, এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয। বঙ্কিম আইন ফেলিয়া বি, এ পরীক্ষায প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র সময় আছে। সেই দুই মাস মাত্র পড়িয়া মেধাবী বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ও বাবু যদুনাথ বসু বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বি, এ। বঙ্কিমের বয়স তখন কুড়ি।

হালিডে সাহেব তখন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি বঙ্কিমের মনস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া, গুণের

পুরস্কার স্বরূপ, বঙ্কিমকে ডেপুটী ম্যাজিষ্টেরের পদ দিলেন। বলা বাহুল্য, তখন এই ডেপুটী ম্যাজিষ্টেরের পদ বিশেষ সম্মানের পদ ছিল। কুড়ি বৎসর বয়সে ডেপুটী বঙ্কিম যশোহরে নিযুক্ত হইলেন। এইখানেই সাহিত্যবন্ধী দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। এই দীনবন্ধু ও পণ্ডিত জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তদানীন্তন কালের যুবা বয়সে, পানদোষ ও অন্যান্য দোষের হস্ত হইতে বঙ্কিম অব্যাহতি পান নাই। অবশ্য, বয়সে সে দোষ শোধরাইয়াছিল।

যশোহরে ছয় সাত মাসের মধ্যেই ডেপুটী বঙ্কিম আপন বিচারক্ষমতা দেখাইলেন। এই যশোহর বাসের সময়েই তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর হয়। সাত মাস যশোহরে থাকিয়া তিনি কাঁথিতে বদলী হইলেন। এই সময়েই তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কাঁথিতে

এক বৎসর থাকিয়া খুলনায় বদলী হন। এই সময় খুলনা অঞ্চলে নীলকর 'বিষবৃক্ষগণের' বিশেষ উপদ্রব ছিল। মরেলগঞ্জের মুরেল ও দুর্দ্দান্ত হিলি সাহেব বঙ্কিমের ভয়ে খুলনা ত্যাগ করিয়া আসাম পলাইল। বঙ্কিমের ওয়ারেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে সেই আসামেও ছুটিল, আসামীগণ ধৃত হইল। যথাসময়ে সদলবল নীলকরগণকে তিনি রীতিমত শিক্ষা দেন। সেই হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে নীলকর উপদ্রব অনেকটা প্রশমিত হয়।

ইহা ব্যতীত এই পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্কিমের আর একটী কীর্ত্তি আছে। খুলনার সুন্দরবনের জলপথে তখন বড় দস্যুভয় ছিল। প্রায়ই নৌকা লুট হইত। বঙ্কিমের শাসনগুণে সেই দস্যুদল একে একে ধৃত হইয়া রাজদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল, দেশও নিরুপদ্রব হইল।

খুলনা হইতে বঙ্কিম ২৪ পরগণার অন্তর্গত

বারুইপুরে বদলী হন। সেই সময় গভর্ণ-
মেন্টের আমলাদের বেতন নির্দ্দেশের জন্ম এক
কমিশন বসে। হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ
প্রিন্সেপ বাহাদুর ঐ কমিশনের সম্পাদক
ছিলেন। বঙ্কিম কিছুদিনের জন্য প্রিন্সিপের
পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। কয় মাস
পরেই তিনি আবার ডেপুটী ম্যাজিষ্টররূপে
বহরমপুর যান। বহরমপুর হইতে মালদহ,
এবং মালদহ হইতে হুগলীতে বদলী হইলেন।

এই সময়ে বঙ্কিমের বড় এক সম্মানজনক পদ
লাভ হয়। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ পদ বড় দুর্লভ।
মেকলে সাহেব তখন গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটরিয়েট
আপিসের কর্ত্তা। ডেপুটী বঙ্কিম এই সময় এই
আপিসে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর অফিসিয়েটিং
পদ পান। মেকলে সাহেবের অধীনে তাঁহাকে
কাজ করিতে হইত। স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও
তেজস্বী বঙ্কিমের ভাগ্যে কিন্তু অধিক দিন এ

কাজ স্থায়ী হয় নাই। মেকলে সাহেব প্রতিদিন বাতি জ্বালাইয়া—কখন বা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন বা রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত আপিসের কাজ-কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু আসিষ্টাণ্ট বা অধীন বঙ্কিম, অপরাহ্ন ৫ টাও বাজিত, আর কাগজ-কলম ফেলিযা উঠিতেন। এজন্য মেকলে একদিন বঙ্কিমকে একটু চাপিযা ধরিলেন। তেজস্বী ও নির্ভীক বঙ্কিম অসঙ্কোচে উত্তর করিলেন,—"আপনারা রাজার জাতি, সুতরাং আপনাদের আশাভরসা অনেক; কালে চাই কি, আপনি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের পদ পাইতে পারেন,—কিন্তু আমাদের আর বেশী আশা কি বলুন? তবে আর কেন খামকা অধিক খাটিয়া শরীর নষ্ট করি?"

উপরওয়ালা মেকলের সহিত বচসার ফল এই হইল যে, বঙ্কিম পুনরায় ডেপুটীরূপে আলিপুরে দেখা দিলেন।

আর এক দিন প্রেসিডেন্সী কমিশনর মনরো

সাহেব অপরাহ্নে ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে ছিলেন, বঙ্কিমও সে সময় উক্ত বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মনরো সাহেবকে দেখিতে পাইয়াও তিনি 'সেলাম' করেন নাই, —তাহার ফলস্বরূপ পর-বুধবারের কলিকাতা গেজেটে দেখিলেন, তিনি উড়িষ্যার জাজপুরে বদলী হইয়াছেন। এজন্য বঙ্কিম প্রধান সেক্রেটরীকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন,—"কি অপরাধে অধীনের এ নিগ্রহ ভোগ! প্রাণপাত করিয়া এত দিন রাজকার্য্য পরিচালনা করিলাম, তাহার এই পুরস্কার,—সুদূর প্রবাসে আমাকে যাইতে হইল।"

কিন্তু জাজপুর গিয়াই তিনি সংবাদ পাই-লেন যে, তাঁহাকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কয়েক মাস হুগলীতে ডেপুটীগিরি করিয়া বঙ্কিম পুনরায় আলিপুরে বদলী হন। এখানে উপরিতন রাজপুরুষের সহিত মনো-

মালিন্যে এবং শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য পেনসন পান। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মানার্থ, তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" ও "সি, আই, ই," উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয় দগের মানের হিসাবে তিনি রাজরাজেশ্বর। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রখর উন্নতির দিনে বাঙ্গালীর এ-বড়-কম কলঙ্কের কথা নয় যে, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখরের কবির লেখনী, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য 'খড় চুরী' 'ধান চুরী'র মোকদ্দমার 'রায়' লিখিয়া অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিভার পূজা করিতে বাঙ্গালী আজিও শিখে নাই।

পুত্রমুখ দর্শন বঙ্কিমের অদৃষ্টে ঘটে নাই;—তাঁহার তিনটী মাত্র কন্যা। ঈশ্বরেচ্ছায়, দৌহিত্র অনেকগুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, কনিষ্ঠা কন্যাটীর শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি বড়ই মর্ম্ম-

পীড়িত হন এবং যার-পর-নাই কাতর হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে পিতৃ বিয়োগ, মাতৃ-বিয়োগ ও ভ্রাতৃ বিয়োগ-ক্লেশও তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহারা চারি ভাইয়েই ডেপুটী ম্যাজিষ্টর। এক শ্যামাচরণ বাদে আর সকলেই সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্যে সঞ্জীবের প্রতিভাও বড় কম নয়। পূর্ণচন্দ্র উপস্থিত আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্টর করিতেছেন।

জ্যোতিষে বঙ্কিমের বিশেষ আস্থা ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু শিখিয়াও ছিলেন। তিনি পেন্‌সন লইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত "হায়ার ট্রেনিং"এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। শুনিয়াছি, এই সভায় তিনি বেদ সম্বন্ধে ইংরেজীতে সুন্দর একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং নব্যতন্ত্রের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে এই সময় তিনি হিন্দুর 'শাস্ত্রপ্রকাশ' কার্য্যে ব্রতী হন। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে

হইতে তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। সেই রোগ কালে দুষ্টব্রণে পরিণত হইয়া ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র, রবিবার বেলা ৩॥ মিনিটের সময় সকল স্মৃতি লোপ করে। ১৩০০ সালের এই "যোড়া শূন্যের বৎসর দুর্ভাগ্য বঙ্গের অতি দুর্ব্বৎসর।

বঙ্কিমের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ বড় অদ্ভুত রকমে হইয়াছিল। ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমের পিতৃদেব, অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাশয় লোক ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার এক ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন গুরু ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী। যাদবচন্দ্রের পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মহাপুরুষ আসিয়া বলেন, "অন্তিমকালে আমি তোমাকে দর্শন দিব।" যথাদিনে পুত্রগণ পিতাকে ৺গঙ্গাতীরস্থ করিয়াছেন এমন সময় সেই মহাপুরুষ তথায় আবির্ভূত হইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া এবং তাঁহার আরও কিছু অলৌকিক মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিম তাঁহার চরণে স্মরণ লন, এবং সেই হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভ হয়।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

জন্মপত্রিকা।

শকাব্দ ১৭৬০।১।১২।৩১।৩০।

গ্রহ স্ফুট।

১৮১৫।১১।২৬।

১৭৬০।১।১২

৫৫।৯।১১ বয়সে মৃত্যু।

ম ৭ র ৬ শু ৩ বু ৬		বৃ ২০
	জন্ম কুণ্ডলী	ল ১৯ অং
চ ১০ ব ১০ কে ১৩		শ ১৬

র	২।১২।৫।২০	চ	০।৫।৫৭।৩৪
ম	১।১৩।৩৫।৩৮	বু	২।১।০।২০
বৃ	৫।২৬।২২।৪৮	শু	১।২।২৬।৫০
রা	১।১৭।৫০।১২	শ	৭।৩।৩।২৮
ল	৯।১৯।০।৪	কে	৫।১৭।৫৫।১২
		হোরালং	১।১৩।২২।০

অষ্টোত্তরী দশা		বিংশোত্তরী দশা	
ম	৬।৬।১৪	কে	৪।২।১২
বু	১৭	শু	২০
	২৩।৬।১৪		২৪।২।১২
শ	১০	র	৬
	৩৩।৬।১৪		৩০।২।১২
বৃ	১৯	চ	১০
	৫২।৬।১৪		৪০।২।১২
রা	১২	ম	৭
	৬৪।৬।১২		৪৭।২।১২
		রা	১৮
			৬৫।২।১২

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতীরত্ন,
৫২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।”

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।

১।

বিশীর্ণ স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। তেমন উন্মাদ আবেগ, উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গভঙ্গ, চপলা চাঞ্চল্য,—কিছুই দৃষ্ট হইত না। বৃন্তচ্যুত, বিশুষ্ক পুষ্প যেমন নিঃশব্দে ভূপতিত হয়, স্রোতস্বতীর গতি তেমনই শব্দহীন, প্রাণহীন,—অথচ কেবল আকর্ষণের বলে গতিমাত্রে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছিল। পথিক তৃষিত-প্রাণে স্রোতস্বতী-পানে ছুটিতেছে,—তৃষা মিটিতেছে না,—আকুল-প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে। পিপাসা যত বাড়িতেছে, প্রাণে ব্যাকুলতা ততই উদ্রিক্ত হইতেছে।

এমনই সময়, সহসা সেই বিশীর্ণ হৃদয়া স্রোতস্বতী পূর্ণতোয়া হইয়া স্ফীত-হৃদয়ে

অপূর্ব্ব গৌরবে কূল ভাসাইয়া প্রবাহিতা হইল। বিশুষ্ক সাহারা "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা" ভূমিতে পরিণত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। কুসুমিত তরুশাখে মধুরকণ্ঠ বিহগ মধুর তান ধরিল। প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে এইবার সেই তৃষার্ত্ত পথিক-কুল নদীতটে বসিল,—প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শান্ত হইল।

সেই একদিন গিয়াছে, আর আজিও এক দিন চলিয়াছে। সেই কাঙ্গালিনী বঙ্গ-ভাষা আজি নানা-রত্ন-সুশোভনা। মরকত-মণি-মাণিক্যে ভিখারিণীর ভাণ্ডার আজি পূর্ণ। ভিখারিণী তখন বঙ্গবাসীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে পারিলেও, তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। হৃদয়ে সে অপরিতৃপ্ত আশা লইয়া বঙ্গবাসী সে সময় যাহা পাইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার করে নাই, বুঝি, বিচার

করিবার সামর্থ্যও ছিল না, কিন্তু বুঝিত, প্রাণের অভাব ইহাতে মিটিতেছে না। তৃষা বাড়িত, আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। সেই দুর্দ্দিনে, আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে, কাহার নবীনা প্রতিভা অজস্রধারে সুধা বর্ষণ করিল। সে 'ভাব-মন্দাকিনী' পানে বাঙ্গালী ধন্য হইল, দুঃখিনী বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল।

সেই সব কথা আজি মনে পড়ে। মনে পড়ে, যখন পাদরী সাহেব-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম এ দেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন। তার পর, একে একে বাঙ্গালার অনেকগুলি সুসন্তান ভাষার উন্নতি-কল্পে ব্রতী হন। মৃত-মহাত্মা রামমোহন রায়, কিছুকাল পরে হইলেও, সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতঃ চারিটী স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তর,—ভাষা গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট ও

অস্পষ্ট এবং ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট ও ম্লান। দ্বিতীয় স্তর,—সংস্কৃতের একাধিপত্য,—সুতরাং অনেক স্থলে নিরর্থক শব্দাড়ম্বর ও তজ্জন্য ভাব-জটিলতা। তৃতীয় স্তরেই বাঙ্গালীর সৌভাগ্যরবি অল্পে অল্পে দেখা দিল। এ স্তরের প্রধান নেতা—মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যের স্রোত একটু ফিরিল। কিন্তু তবুও বঙ্গবাসীর আশা মিটিল না।

এই সময়ে আর একজন মহারথী দেখা দিলেন। "বঙ্গসাহিত্যে ৺ প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে।" * তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি

---

* এ কথা স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করা যাইতে পারে। কিন্তু তবুও সাহিত্য-সূর্য্য মেঘমুক্ত হইল না। ভাষা অনেকাংশে সরল, তরল ও টলটল হইল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ রহিল না,—নদীতে তরঙ্গ উঠিল না।

এই সময়ে প্রকৃতির অন্তরালে নব্যবঙ্গের নেতা, প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, প্রকৃত সাহিত্য গুরু জন্মগ্রহণ করিলেন,—যাঁহার অমৃতময়ী কথা আলোচনা করিয়া আজি আমি আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিব।

পূর্ব্বাবধি এমনই একটা রহস্য জগতের বুকে লুকান' আছে, যাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে যখনই কোন বিশেষ অভাব পড়িয়াছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাধনা বলে সে অভাব পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান এবং মানব-হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করেন।

বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আজ অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিতেছে। বঙ্গভাষার যখন সব থাকিয়াও যেন-কিছু নাই,—যখন ভাষা, শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালী হইলেও একরূপ অচেতন বা প্রাণহীন, তখন অতি নিভৃতে, বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, "সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর" অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। সুপ্ত-সিংহ সহসা জাগিয়া উঠিল। ধন ধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই 'কর্ম্মযোগী'। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, এ যুগে, আর কোথাও দেখি না। মনের কথা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় কতকটা গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে,—তথাপি অম্লান-বদনে বলিতে পারি, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষা এক দিকে, আর একা বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে। কারণ, সমগ্র বাঙ্গালী নর-নারীর

হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।৹ এ যুগে, এমন সৌভাগ্য, আর কাহারও হয় নাই। বঙ্কিম বলিতে বাঙ্গালার একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝায়। সত্যই বাঙ্গালীর মধ্যে বঙ্কিম একজন মাত্র। দুঃখের কথা কি কম, ঔপন্যাসিক দলের মধ্যে বঙ্কিমকে প্রথম আসন দিয়া, ঠিক্ দ্বিতীয় আসনে বসাইবার আর কাহাকেও দেখি না। মুখে কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন,—কোন-না-কোন প্রকারে এ যুগে বঙ্কিমের শিষ্য নয় কে? যিনি বঙ্কিমকে গালি পাড়েন, তিনিও সেই বঙ্কিমী-ঢঙে "সাদার পিঠে কালি" দিয়া থাকেন! তাই বলিতেছিলাম, যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন বঙ্কিম, যতদিন বাঙ্গালী, ততদিন বঙ্কিম। কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমিও একবাক্যে বলি,— "তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-

সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোত-স্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া, আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য" ।*

বস্তুতঃ, ভগীরথের ন্যায় অপূর্ব্ব সাধনা-বলে, বঙ্কিম নব-জলধারা ঢালিয়া সেই ক্ষীণ-হৃদয়া, রুদ্ধ স্রোতস্বতীকে সাগরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। "আলালী" ও "সাগরী" ভাষারূপ জমির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, তিনি সাহিত্যের চতুর্থ স্তর অক্ষয় ও অজেয় করিয়া গিয়াছেন। তবে দুঃখ এই, মহারথী অর্জ্জুনের-শরাঘাতে-বিদীর্ণা ভোগবতীর ন্যায়

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"।
—সাধনা।

বঙ্কিমের বিরহে নেতৃহীন বঙ্গ-সাহিত্য আজি শতধারে বুক ভাসাইতেছে। কারণ, তাহার সকল সাধ আজিও মিটে নাই।

২।

সাহিত্যের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে, উপরে একরূপ বলিয়া আসিয়াছি। ফল কথা, প্রথম তিন স্তরের ভাষা যেরূপ হউক, ভাবের একান্ত অভাব ছিল। এ কথা বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। ভাবহীন ভাষা যতই আড়ম্বরপূর্ণ হউক, প্রকৃত চিন্তা-শীল ব্যক্তির নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। দীর্ঘ-সন্ধি-সমাসযুক্ত বাক্যচ্ছটা ও বর্ণনা-ঘটা দেখিতে, শুনিতে এবং স্থল-বিশেষে পড়িতেও মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে না; সে কথা বুকে বিদ্ধ হয় না। ছোট ছোট ভাবময়ী কথা কিন্তু

মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। এই জন্যই গীতি-কবিতার এত আদর। এই জন্যই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি কাব্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের ভাষা সেই গীতি-কবিতার ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে আমার এক এক বার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি-কবিতা পড়িতেছি। স্থানান্তরে আমি একথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু বঙ্কিমের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা সাহিত্য, এ রসের কাঙ্গাল ছিল। হয় কতকগুলা আভিধানিক 'কটমট' শব্দ,—অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত,—কেবল অক্ষরগুলা বাঙ্গালা, —নয় ঘোর গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়া-ছড়ি, অধিকন্তু 'এবং' 'ও' 'অপিচ' প্রভৃতির বাড়াবাড়িতে সুকুমার সাহিত্যের স্থান পূর্ণ করিত। দৃষ্টান্ত

উদ্ধারের আবশ্যক নাই,—এ কথা বোধ হয় ভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত।

সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, ভাবের অভাব ছিল বলিয়াই ভাষায়ও তখন জীবনী-শক্তি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। অমন মধুময়ী ভাষাও যেন কেমন বিনাইয়া-বিনাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য পরে কা কথা। আসল কথা, ভাবযুক্ত মর্ম্মকথা ভাষার পক্ষে যত কার্য্যকরী, ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া অবাস্তব শব্দাবলীর সংযোজনে, ভাষার পরিপুষ্টি ত দূরের কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনা মাত্র। একটি ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্প যে সুগন্ধি দান করিবে,

বাল্মীকিকৃত কেরবীর সাধ্য কি যে, তাহার স্থান অধিকার করে ?

সাহিত্যের এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে তদানীন্তন সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কারণ, সাহিত্যের উন্নতি-অবনতির পক্ষে সমাজও কতকটা দায়ী। সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, ও রুচি-প্রবৃত্তির সহিত সাধারণ সাহিত্য-সেবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তখনকার সমাজের সাধারণ-শিক্ষা খুবই কম ছিল। মোটামুটী বৈষয়িক কাজ-চালাইবার উপযোগী শিক্ষাই তখন একরূপ পর্য্যাপ্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, "পড়ুয়া পণ্ডিত" ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। ইংরাজী-ঢঙে তখন দেশ মাতোয়ারা। "নিমচাঁদ"রূপী বহু শিক্ষিত-পুঙ্গব তখন বঙ্গ-সমাজে বিরাজ করিতেছেন।

সুতরাং সমাজে তখন গলদ ঢের। সে সব সমাজ-কালিমা দেখাইবার সাধ আমাদের নাই। তবে এখানে কেবলমাত্র তদানীন্তন সমাজের রুচির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিব।

সরস রসিকতা, অবশ্য সর্ব্বদেশে, প্রায় সর্ব্ব সময়েই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই রসিকতার নামে ঘোর অরসিকতা বা নীরসতা তখনকার দুর্ভাগ্য বঙ্গসমাজের একচেটিয়া ছিল ভাঁড়ামী, ফাজলামী, গ্রাম্য-ইয়ারকি ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালিকে তখনকার অনেক লোকে 'রসিকতা' বলিয়া জানিত। অল্পদর্শী লেখকগণও তাই 'বাহবা' পাই-বার লোভে, কেতাবে এবং কাব্যে সেই পূতিগন্ধময় পাপআবর্জ্জনা সংগ্রহীত করিতেন। লিপিকুশল লেখক না হয় সে-গুলা একটু গুছাইয়া লিখিতেন। কিন্তু ভাঁড় যতই 'তুখড়' হউক, চিরদিনই সে ভাঁড়,—বঙ্গদর্শক বুদ্ধি-

মন্ত্র পাঠকের নিকট সে কখনই শ্রদ্ধার আসন পাইবে না। অবশ্য, এ সব- খচরা কবি ও লেখকদের জন্য তখনকার সমাজও কতকটা দায়ী। এই জন্যই বলিতেছিলাম, সমাজের সহিত সাহিত্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

কারণ, "জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়-জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য, যে কালে জাতীয়-জীবনের যে ভাব,—জাতির যাহা রীতি-নীতি প্রণালী-পদ্ধতি—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়।—সেক্সপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সম-সাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক-যুগ অতীত হইয়াছে;—সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই;—কিন্তু

বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে”। *

কথাটী অতি সত্য। কিন্তু এ কথাটীর সহিত আমি আর একটু যোগ করিতে চাই। সেটুকু এই, প্রকৃত প্রতিভাবান কবি বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার সাধের আলেখ্যখানি অঙ্কিত করেন। অর্থাৎ জীবনের উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কবি এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে জগৎ পুণ্য-পবিত্রতাময়, সুখশান্তিপূর্ণ এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর। কবির কল্পনা-প্রসূতা মানস-দুহিতা এই পৃথিবী তাঁহার ভবিষ্য বংশধরগণ উপভোগ করেন। কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজ তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না।— অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার সেই উদার

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত ‘প্রাচীসাহিত্যালোচনা”।——সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

কল্পনা ও বিশ্বজনীন প্রেম আবদ্ধ থাকিতে পারে কি? তাই তিনি আবশ্যক বোধে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন,—যুগ যুগ ধরিয়া যাহার বিমল-রশ্মি নিখিল সংসার উপভোগ করিতে থাকে। তাই উচ্চশ্রেণীর কবির সেই অপূর্ব্ব আলেখ্য দর্শনে বর্ত্তমান সমাজের যেমন হিত হয়, সময় বিশেষে তেমনই অহিতও সংঘটিত হইয়া থাকে। এ অহিত সত্ত্বেও কবি জগতের পূজ্য, সমগ্র নরনারীর পরম প্রীতির পাত্র। কারণ প্রকৃত কবিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক। দার্শনিক বা ঐতিহাসিকের গভীর গবেষণায়ও যে তত্ত্ব প্রকটিত না হয়,—মাহেন্দ্র-যোগসংঘটনে, কবির ক্ষণমাত্র চিন্তায়ও সে রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।—প্রকৃত কবির তুল্য বন্ধু আর কে আছে

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়াই

আমরা ঐ সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি। কারণ, আদর্শ-মূলক উপন্যাসেই (idealistic novels) বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত।—সমাজ যেমন আছে, ঠিক তেমন নহে,—কিন্তু সমাজ যেমন হইতে পারে বা হওয়া উচিত সেইরূপ আদর্শ লইয়া তিনি তাঁহার উপন্যাসের 'ছক' প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই ছক সম্মুখে রাখিয়া এক একটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, "কবির সৃষ্টি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া আমি মনে করি না। জগতের বুকে যে কথা লুকান' আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"। *

কবির আদর্শ বিচিত্র রামধনুর ন্যায়,—

---

* লেখক-প্রণীত 'দুলালী' নাম্নী উপন্যাসের উৎসর্গ-পত্র।

কত বর্ণ, কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য! রামধনু যেমন আকাশের গায়ে অবস্থিত, কবির আদর্শও তেমনই তদ্বিরচিত কাব্যে নিহিত। তুমি যতই অগ্রসর হইবে, রামধনুও ততই পিছাইয়া যাইবে,—আবার তুমি যেমন পশ্চাৎ হটিয়া আসিবে, রামধনুও তেমনই মনোহর মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে প্রকটিত হইতে থাকিবে। কবির আদর্শও এইরূপ। তুমি আমি সে আদর্শে উপনীত হইতে পারিতেছি না বলিয়া কি কবি সে আদর্শকে খাটো করিবেন? সংসার সৌন্দর্য্যময়। কবি এই সৌন্দর্য্যের হাটে আপনা হারাইয়া, তাঁহার সাধের আলেখ্যখানি লইয়া বসেন,—তুমি দেখ আর নাই দেখ, তিনি এই আলেখ্যখানি আঁকিয়াই সুখী। প্রকৃত কবি ভিন্ন সৌন্দর্য্যের ধ্যান আর কে করিতে পারে? তাই "সারদামঙ্গলের" কবি এক দিন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে গাহিয়াছিলেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার"।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাসেই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাই। বিশেষতঃ, তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" ও "চন্দ্রশেখরের" কিয়দংশ এ বিষয়ে অতুলা। যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব

বঙ্কিমের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথায় বলিয়াছি। কিন্তু সৌভাগ্যবশে, সময়গুণে, তখন শ্রীমধুসূদন জীমূতমন্দ্রে "মেঘনাদের" ভেরী বাজাইয়াছেন। রঙ্গলালও ওজস্বিনী ভাষায় "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" বলিয়া দীপায় রাগ্গাব দিতেছেন। ইহা ব্যতীত ভূদেব "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" বিরচিয়াছেন,—কালী-

প্রসন্ন সিংহ 'হুতুমে' বাহবা লইতেছেন ,—রামনারায়ণের "নব নাটক", ও "রুক্মিণী হরণ" এবং দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "লীলাবতী" তখন একে একে দেখা দিতেছে। কিন্তু ইহার আগে 'গুপ্ত- কবি'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বঙ্কিমের গুরু আসর জমাট করিয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর প্যারিচাঁদ মিত্র শুভক্ষণে সরল ও সরস ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" বিরচিলেন। দেশ মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একদিকে সংস্কৃতপক্ষপাতীগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন, অন্যদিকে নব্য-তন্ত্রের পাঠকবৃন্দ সাগ্রহে "আলালী ভাষা" পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, উভয় দলই প্রতারিত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে সে "আলালী" ভাষার উপরও কালের যবনিকা পাত হইল।

৮।

এইবার জননী-জন্মভূমির প্রিয়পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিলেন। মেঘমুক্ত সূর্য্য চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এইবার প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-নৈপুণ্য, অপূর্ব্বত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি ও জাতীয় ভাব এইবার গদ্য-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল। ইহার উপরও প্রতিভার একটী উচ্চ নিদর্শন প্রকটিত হইল,—যাহা আমাদের বঙ্কিমের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধন। রসজ্ঞ বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য" আনয়ন করেন।—"তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা

প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গম্ভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গম্ভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক নিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"* কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম বাবুর এই "শুভ্র-সংযত" হাস্যকে "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা"র সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। শুধু হাস্যরস বলিয়া কেন, সকল রসেই বঙ্কিমচন্দ্রের এই "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা" পরিলক্ষিত হয়।

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"।
—সাধনা।

লোকবিশ্রুত "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসই বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ না পাইলেও, স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয়ভাব বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশলাভ করিল। সিংহ-শিশু সাহিত্যকাননে আবির্ভূত হইবামাত্র ফেরুপাল তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দলাদলি-প্রিয় বাঙ্গালী বঙ্কিমকে লইয়া নানারূপ কুৎসিত হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা লইয়া পণ্ডিত-মহলে মস্ত 'ঘোঁট' হইতে লাগিল। "শব-পোড়ান" ও "মড়াদাহ"রূপ ভাষা বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব বাঙ্গালা সাহিত্য মাটী হইল,—এইরূপ ধুয়া ধরিয়া কোন কোন পণ্ডিত আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। নির্ভীক বঙ্কিম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। স্থিরলক্ষ্যে আপন গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিলেন।

প্রতিভার আলোক সকলে সহিতে পারে না। যখনই যে সমাজে কোন প্রতিভাবান্ মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই সেই সমাজের জন-সাধারণের মধ্যে প্রথমতঃ একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'এই লোকটা আমাদের চেয়ে কিসে বড়', তাহার বাদানুবাদ হয়। অন্যকে ছোট করিতে পারিলেই যেন তাহারা বড় হইল। কিন্তু কালের তুল্য বিশিষ্ট সমালোচক আর কেহ নাই। কাল, কিছুদিন পরে সেই জন-সাধারণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়, কি গুণে সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সকলের বড়। তখন সেই জন-সাধারণ, যে মুখে বিষ-বহ্নি উদ্গীরণ করিত, সেই মুখে অমৃতময় স্তুতিবাদের লহরী লইয়া সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে পুষ্প-চন্দন অর্পণ করিতে থাকে। বঙ্কিম, নিজ জীবনেই এই স্তুতিনিন্দার

চরম-সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সত্যের জয়ই বিঘোষিত হইল। প্রতিভা পূর্ণরূপে আপন আধিপত্য স্থাপন করিল।

এতদিনে বাঙ্গালীর গৌরবের ধন "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল।

৪।

এইবার নদীতে কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। স্রোতস্বতী কুলুকুলু রবে সাগরাভিমুখে ছুটিল।

সাহিত্য-কাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানাজাতীয় নয়ন-তৃপ্তিকর, অতি মনোহর, মধুগন্ধময় ফুলদল বিকশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমরগুঞ্জনে, পাদতল-বিধৌত তটিনীর গানে প্রকৃতি অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাসি, চকোর চকোরীর সেই চন্দ্র-সুধাপান,

ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি—সকলই মনোহর। কর্ম্মযোগী বঙ্কিম এইবার সত্য সত্যই বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালীর গৌরব, জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র 'কোহিনুর'। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা, ততদিন বঙ্গদর্শন।

মহারথী বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিয়াও কিছুদিন যবনিকার অন্তরালে ছিলেন। ঠিক কাল পূর্ণ হইলে ঋতুরাজ সদলবলে সাহিত্য-কাননে দেখা দিলেন। বন আলোকিত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। বসন্তের আবির্ভাবে জীব-জগতের জড়ত্ব ঘুচিল।

কত ভাব, কত চিন্তা, কত উদ্যম, কত আশা, কত আলো লইয়া বঙ্গদর্শন জড়প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিল। এইক্ষণ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। ধর্ম্ম প্রচারক ও নীতিবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়া গগন-ভেদী

বক্তৃতা দিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, এক বঙ্গদর্শন তাহা সমাপ্না করিল। বাঙ্গালার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও কাব্য-সাহিত্য এইবার আপন পথ পাইল। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সুদূরদর্শিতা ও সত্যবাদিতার গুণে বঙ্গদর্শন অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিল।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে সকলেই—বিশেষতঃ বিদ্বজ্জন-সমাজ বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিম বাবু গভীর দুঃখে সে সকল কথা বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কুশলতা শূন্য, হয়ত ইংরাজী গ্রন্থের

অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া মাত্র, ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"

সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-লাভ করিয়া, জীবনের শেষ দশায়ও তিনি এক স্থলে অতি বিনীতভাবে বলিয়াছেন, "যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা কান্তার মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।" * বাঙ্গালার একখানি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার সাধ তাঁহার বরাবর ছিল। কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু আশানুযায়ী তৃপ্তিলাভ করিতে

* বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২।

পারেন নাই। তাই তিনি গভীর দুঃখে ঐ কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কে বলে, বঙ্কিম বাবু অহঙ্কারী ছিলেন? সর্ব্ববিষয়েই শক্তিমন্ত হইয়াও তবে তিনি কেন এত বিনয়ের পরিচয় দিবেন?—"বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুর-দারীর ফল এই কয়েকটী প্রবন্ধ। বলিতে পারিনা যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনাকপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহা লিখুক না কেন,—সে মাতৃ-পদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি,—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

স্বদেশভক্ত, মায়ের সুসন্তান, বিনীত বঙ্কিমের এই উক্তি ঐতিহাসিকদিগের ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু তথাপি, তাঁহার বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বঙ্গদেশের কৃষক, ভারত-কলঙ্ক ও বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল। তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল, দেখিল, চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, মনস্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দর্শন, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানাবিষয়ক চিন্তা, সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক ও চিন্তাশীল বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অক্ষযভাষা ও "গ্রাবু" "দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধ, ডাক্তার রামদাস সেনের প্রত্নতত্ত্ব, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাল্মীকি ও

তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" দীনবন্ধুর সরস রসিকতা প্রভৃতির সাহায্যে। বঙ্কিম অজেয় বলবিক্রমে সাহিত্য-রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বয়ং সেই রাজ্যের অধিপতি হইয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি আত্মবলে, লেখক হইয়াও সমালোচকের পদে আসীন হইলেন। সমালোচনায়ও তিনি অপূর্ব্বশক্তি-মত্তার পরিচয় দেন। তিনি এক হস্তে পুষ্প-মাল্য ও অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমালোচকের আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রকৃত প্রতিভার নিকট সকলকেই অবনত-মস্তক হইতে হয়। নিম্নশ্রেণীর অপকৃষ্ট লেখক-সম্প্রদায় ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় কে কোথায় উধাও হইয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যেও তাই তখন তেমন কণ্টক-আবর্জ্জনা প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। ক্বচিৎ-কদাচিৎ যে দুই

একখানা অসার গ্রন্থ প্রকাশ হইত, তাহাও শেষে 'অগ্নি পরীক্ষার' ভয়ে দূর হইতে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিত।

ন্যায়ের কঠোর দণ্ড এই এক দিকে যেমন, অন্যদিকে আবার গুণীন গ্রন্থকার, গুণের পুরস্কারও ততোধিক প্রীতিভরে পাইতেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার কোন সাহিত্য-বন্ধুকে এই কথা বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালার এই শিশুকাল সমালোচনায়ও আমি খুব কঠোর বটে,—কিন্তু যেখানে, প্রতিভা বা অপূর্ব্বতার একটুকুমাত্রও গন্ধ পাই,—সেখানে আমি লেখককে কোল দিই। তবে যাহাদের কস্মিনকালে কিছু হইবে না,—সুতরাং এ পথও যাহাদের নয় বুঝিতে পারি, তাহাদিগকে অকারণ প্রশ্রয় দিই কেন?"

বস্তুতঃ, এই সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা-জ্ঞান এবং গুণগ্রাহিতা যদি তাঁহাতে না থাকিত,

তবে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা আজি কি হইত বলা যায় না। এবং বঙ্গদর্শনও সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত রত্ন রাখিয়া যাইতে পারিত কি না, সন্দেহ-স্থল। কারণ, সমালোচনার উৎকৃষ্টতা বঙ্গদর্শনের একটী বিশিষ্ট গৌরব। সুদক্ষ সমালোচক না হইলে, লেখক তাঁহার নিকট মাথা নোওয়াইবে কেন? আজিকার দিনে সাহিত্যের ভিতর যে এত কণ্টক-আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ প্রকৃত সমালোচকের অভাব, বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী সমালোচকের অভাব। সমালোচক-রূপ দক্ষ মালীর অভাবে বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্যের সেই "সাজান বাগান" শুকাইয়া যাইতেছে। কেহ কাহাকে মানে না,—সম্ভ্রম-ভয়-সঙ্কোচের চক্ষে কেহ কাহাকে দেখেও না। তাই সুকুমার সাহিত্য-কাননে আগাছা-কুগাছা-কণ্টক-আবর্জ্জনার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে,

অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক বেগ পাইয়া, পাযে কাঁটা-ফোটার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলে, তবে এক আধটী ভাল ফুল তুলিতে পারা যায়।

বঙ্কিম বাবুর সহিত এই প্রবন্ধ লেখকের এক দিন এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন, "যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে সুরু কর।—ইহাতে তোমার ঐ * * * মাসিক পত্রিকাও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।"

সমালোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর নিজের মত এইরূপ।

"উত্তর-চরিতের" সমালোচনার পূর্ব্বে বিস্তৃত সমালোচনা কিরূপে করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানিত না,—বঙ্গদর্শনই প্রথম সেই পথ দেখাইল। বঙ্কিমের এই সমালোচনাশক্তি, বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

বঙ্কিমের কি তদানীন্তন সাহিত্য-সহচরগণ, কি ইদানীন্তন উদীয়মান লেখক-সম্প্রদায়—সকলেই বঙ্কিমের আলোকে অল্প-বিস্তর আলোকিত। আজিকার দিনে সাহিত্যে এই যে আধ্যাত্মিকতার প্রাদুর্ভাব, তাহার মূলও সেই বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই প্রথমে আর্য্যশাস্ত্রের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ, বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এত গবেষণা, প্রবন্ধের এত বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বত্ব, এবং সর্ব্ববিষয়ে এত উদ্ভাবনী শক্তি, এখনকার দিনে আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাই না। তখন, এক বঙ্কিমই যে 'একা-এক-শ' ছিলেন। এক দিকে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা, অন্য দিকে আবার তেমনই স্বাভাবিক ও সরল রঙ্গরস, হাস্য কৌতুক বিদ্রূপ। আবার তাহা প্রকাশের ভাষাই বা কিরূপ।—সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শিনী। তা কি বিজ্ঞান, কি দর্শন; কি

ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি সমালোচনা, কি উপন্যাস,—সে 'ভাব-মন্দাকিনী', মর্ম্মস্পর্শিনী, লীলাময়ী ভাষায় ও সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় কি আর তুলনা আছে? আবার যখন সেই ক্ষিপ্ত "কমলাকান্ত" অতি মিষ্ট, অতি কোমল, অতি করুণ ও ঈষৎ কান্নার সুরে বাঁশরী বাজাইয়া বাঙ্গালী নর-নারীকে এক দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং যে গানের সুরে সুর মিলাইয়া বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এক মাত্র "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন,—বঙ্কিমের সে ভাষার তুলনা কোথায়?

প্রথম চারি বৎসর অতি দক্ষতার সহিত "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদন কার্য্য করিয়া, বঙ্কিম বঙ্গবাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সঞ্জীব বাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হন। বঙ্কিম বাবু তখনও ইহাতে নিয়মিতরূপে

লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধাবলী ইহাতে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বাবু চন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কবি নবীন-চন্দ্র সেন, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি অনেক উদীয়মান লেখক বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—যাঁহাদের যশঃসৌরভে আজ বঙ্গ-দেশ আমোদিত।

কিন্তু ক্রমেই বঙ্গদর্শন হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সঞ্জীব বাবুও কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন।

দূরদর্শী বঙ্কিম কিন্তু সাহিত্যের গতি বুঝিয়া, দিন থাকিতে খুব সম্মানের সহিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" উপলক্ষে তিনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কত মূল্যবান্। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশআবস্ত হয়, তখন সাধারণেব পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক-পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। * * * আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভাব গ্রহণ কবিযাছেন দেখিযা, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিযাছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। * * * যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিবদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পাবে না। * * * আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদব ও উৎসাহেব কামনা করি নাই, কিন্তু সাধাবণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন বাখিতাম কি না সন্দেহ। যে সকল সহযোগী

বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটু স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ-শ্রেণীর দেশী সংবাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতি-কূলতা করিয়াছিলেন। * * চারি বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ্ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জল-বুদ্‌বুদ্ জলে মিশাইল।"

কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিবার যোগ্য।

এইবার প্রতিভার গতি আর এক পথে ছুটিল। সাহিত্য, সমাজ, দেশ তাহাতে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিল, যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

৫।

সাধারণের অপরিচিত, অতি দুর্গম, বিদ্বজ্জন-সমাজ-ঘৃণ্য নূতন একটি পথে আসিয়া প্রতিভাবান্ বঙ্কিম আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। বিশিষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তদানীন্তন হুজুগে মাতিলেন না। যশঃ, সম্ভ্রম ও নামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সবটা মন-প্রাণ এক করিয়া, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইলেন! যদিও তিনি তরুণ বয়সে "Indian Field" নামক কাগজে "Rajmohan's Wife" নামে একখানি ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশ মাত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতি উচ্চলক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।—হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ও প্রেম দিয়া তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অথচ ইংরাজীতে তিনি কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া-

ছিলেন, তাহা মনস্বী হেষ্টির সহিত তাঁহার তর্ক-যুদ্ধে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। হেষ্টি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এ কথা লিখিয়াছিলেন, "এতদিনে আমি একজন প্রকৃত পণ্ডিতকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পাইলাম।" বঙ্কিমের অনেক বিশিষ্ট শিষ্যও তখন বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবুর বাঙ্গালা লেখা অধিক মিষ্ট, কি ইংরাজী লেখা অধিক মিষ্ট?" বল দেখি, চিরদিন ইংরাজী লেখার চর্চ্চা রাখিলে বঙ্কিম কত বড় ইংরাজী-লেখক হইতে পারিতেন?

কিন্তু প্রতিভা ত শুধু নামের কাঙ্গাল নয়,—প্রতিভা কাজ চায়,—পৃথিবীতে কিছু নূতন জিনিস দিবার আশা রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার ফল,—তদ্বিরচিত অতি অপূর্ব্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী। বিশেষ উপন্যাসে বঙ্কিমের অসাধারণ অধিকার। বিশ্ব-বিশ্রুত বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীর নূতন পরিচয়

আর কি দিব? আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের ঠিক সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। তবে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি ও বলিব, তাহা কতকটা ভক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। কবির ভাষায় বলি,—

"তোমারি চরণ, কবিয়ে স্মরণ,
চ'লেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমারে
ধরি এই মনোরথে॥"

'দুর্গেশনন্দিনীর' পূর্ব্বে বাল্যকালে বঙ্কিম "ললিতা" ও "মানস" নামে দুইটী পদ্যময় গল্প লিখেন এবং পঠদ্দশায় একটী পুরস্কার-প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "দুর্গেশনন্দিনী"কেই আমরা বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলিয়া গণ্য করিব। অবশ্য ভূদেব বাবুর "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের

ঘরের দুলাল" তৎপূর্ব্বে বিরচিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে "দুর্গেশনন্দিনী" হইতেই বাঙ্গালায় প্রকৃত উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি না হইলেও, গদ্য-সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা, রচনা-নৈপুণ্য ও জাতীয়ভাব এই প্রথম প্রবেশ করিল। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিম বুঝিলেন, সরস গল্প গুছাইয়া বলিতে পারিলে সহজেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাই তিনি, প্রধানতঃ পাঠক জুটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা উপন্যাসে নিয়োজিত করিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাস কিরূপ মনোজ্ঞ, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশও তাহার সাক্ষী। জর্জ্জ ইলিয়টের গভীর-ভাব ও লিপি-কুশলতা, ভিক্টর হিউগোর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সরস ও মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা এবং স্কটের বৈচিত্র্যময় প্লট—এই চারি

জনের কিছু কিছু বঙ্কিমের মধ্যে দেখিতে পাই, অথবা এই চারিজনের কিছু কিছু লইয়াই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র। সুতরাং উপন্যাস-জগতে তিনি রাজ-রাজেশ্বর।

বঙ্কিমের এই উপন্যাসের ভাষার সহিত আমাদের দেশের 'কথকতা'র তুলনা করিতে পারি। কথক যেমন মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে অল্পেই শ্রোতাকে মোহিত করেন,—বঙ্কিমের ভাষাও সেইরূপ সমজদার ও অসমজদার সকল শ্রেণীর পাঠককে শীঘ্রই আকৃষ্ট করিতে পারে। তাঁহার ভাষায় বুঝি কিছু মাদকতা আছে, যাহা পাঠে পাঠককে তন্ময় হইতে হয়! আবার যখন সেই ক্ষিপ্ত 'কমলাকান্ত' অতি মিষ্ট, অতি কোমল, অতি করুণ ও ঈষৎ কান্নার সুরে বাঁশরী বাজাইতে থাকে,—বল দেখি, তখন কোন্ বাঙ্গালী সন্তান ক্ষণকালের জন্য না আত্মহারা হয়? তাই বলিতেছিলাম, ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের

মত—যখন যেমন ইচ্ছা—ব্যবহার করিতে এক বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ সমর্থ হন নাই।

একবার যেন শুনিয়াছিলাম, কোন এক খানি পার্শীগ্রন্থে একটী গল্প আছে, এক লেখকের ভাষার উপর প্রবল আধিপত্য জন্মিয়াছিল। ভাষা যেন লেখকের কিঙ্করী-বিশেষ ছিল। সেই লেখক আত্ম-জীবনবৃত্তে লিখিতেছেন, "আমি যখন লিখিতে বসি, তখন আমার চারিদিকে অপ্সরানিন্দিত নারীমূর্ত্তি বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত, নয়ন-তৃপ্তিকর, মনোহর বসন-ভূষণ পরিয়া মধুর নৃত্য করিতে থাকে এবং সাগ্রহে, উপযাচকভাবে বলে, 'আমাকে গ্রহণ কর,—আমাকে গ্রহণ কর।' ভাষা তখন আমার আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করী হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতে পারি। যাঁহাদের ধারণা, সরল ও মধুর ভাষায় ভাবের গাম্ভীর্য

নষ্ট হয়,—অধিকন্ত শব্দ-সম্পদের অভাবে ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগকে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী একটু বিশেষ মনো-যোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। হেলায়-তাচ্ছিল্যে পড়িলে হইবে না,—একটু শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। কারণ, হাসি-মস্করার সহিত অবজ্ঞাভাবে বই পড়িলে,—অন্য পরে কা কথা,—স্বয়ং বেদব্যাসও হারি মানেন! অতএব, বঙ্কিমের উপর যাঁহাদের "নিষ্কাম রাগ" আছে, করযোড়ে তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, এই প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে, বঙ্কিমের যে কোন-এক-খানি বই, ভাল করিয়া পড়িবেন। তাহা হইলে, বঙ্কিমের সহিত এই প্রবন্ধ-লেখককেও আর 'জাহান্নবে' যাইতে হইবে না। কারণ, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে, সকল-কথার আলোচনা করিতে পারি, এমন সময়ও নাই এবং শক্তিও নাই।

৬।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি কখন কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রতিভার এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমের জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। অবশ্য, সাধারণতঃ, তাঁহার উপন্যাসে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী," "কপালকুণ্ডলা" "রজনী" এবং "চন্দ্রশেখরের" কিয়দংশের ভিত্তি সুকুমার কাব্যের উপর স্থাপিত।—নায়ক-নায়িকার প্রেমই ইহার মূলাধার। তারপর বঙ্কিমের দৃষ্টি—হিন্দুর সংসারে ও সমাজে প্রবিষ্ট হইল। তাহার ফল তদ্বিরচিত—"বিষবৃক্ষ," "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "দেবী চৌধুরাণীর" কিয়দংশ। অতঃপর মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্মভক্তি ফুটিয়া উঠিল।—তাহার ফল—"আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী"র

কিয়দংশ ও "সীতারাম"—এবং আর এক অংশে নূতন সংস্করণ "রাজসিংহ"। কিন্তু এই তিন স্তরেরই প্রথম ও প্রধান উপাদান—প্রেম। মানবহৃদয়ের অতি কোমল, অতি সুন্দর, অতি স্বাভাবিক ভাবটি অবলম্বন করিয়া তিনি বিবিধ প্রকারে, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রেমের বৈচিত্র্য নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয় আছে। উপরে যে ভাবে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ করিলাম, তাহা কিন্তু ঠিক পর-পর লেখা নয়। নিম্নলিখিত সময়ে বঙ্কিম নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি প্রণয়ন করেন,—

১৮৬১ খৃঃ অঃ—দুর্গেশনন্দিনী।

১৮৬৭ খৃঃ অঃ—কপালকুণ্ডলা।

১৮৭০ খৃঃ অঃ—মৃণালিনী।

১৮৭৯ খৃঃ অঃ——১২৭২ সালে বঙ্গদর্শনের

আবির্ভাব হয়। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবুর বাকী উপন্যাসগুলি, কোনখানি সম্পূর্ণরূপে কোনখানি অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কেবল মাত্র "সীতারাম" খানি "প্রচারে" এবং "দেবী চৌধুরাণী" খানি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়। অতঃপর, যথাসময়ে উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এখন বুঝিয়া দেখুন, যে হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগ আমরা করিয়াছি, তাহাতে আর উল্লিখিত হিসাবে বঙ্কিমের মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি ঠিক খাপ খায় না। ইহার উপরও আবার বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক গবেষণা, গভীর ধর্ম্মতত্ব ও

গীতার সমস্যা-ব্যাখ্যা এবং লোকরহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি আছে। তবেই বুঝিয়া দেখুন, একটা লোকের প্রতিভার গতি কখন্ কোন্ পথে ছুটিয়াছে, ঠিক নির্ণয় করিবার যো নাই। কিন্তু ইহাতেই বঙ্কিমের অধিক কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনের ক্রমবিকাশ ঠিক পর্ব্বতের সহিত তুলনীয়। পর্ব্বত যেমন আঁকা-বাঁকা, সূক্ষ্ম-স্থূল-বন্ধুর ও বিশৃঙ্খলতায় অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, বঙ্কিমের প্রতিভাও সেইরূপ শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু অসীম শক্তিশালিনী ও লাবণ্যময়ী। পর্ব্বত সুন্দর কেন?—না, তাহা বৈচিত্র্যময়।—এই প্রস্তর, ঐ গহ্বর, এখানে গুহা, ওখানে প্রস্রবণ, এই আলো, ঐ ছায়া,—আবার ঐ গগনভেদী শিখর, —প্রকৃতির সে অপূর্ব্ব-দৃশ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়াও সুন্দর, অতুলনীয় সুন্দর।—বিশৃঙ্খল

বলিয়াই সুন্দর, অথবা পর্ব্বতের এই বিশৃঙ্খলতাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। বাহিরের এই সৌন্দর্য্য ব্যতীত আবার বুকে কত আশা, কত প্রেম!—পর্ব্বত কত জীব-জন্তুর আশ্রয়-স্থল, কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাধি-মন্দির,—কত রত্নের আকর!—জীবনদায়িনী তরঙ্গিনী কুলু কুলু রবে পর্ব্বতের পাদতল বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা,—পর্ব্বতের ভিতর-বাহির সুন্দর।

বঙ্কিমের প্রতিভা সম্বন্ধেও আমি এই কথ বলিতে পারি। তাঁহার প্রতিভার কোন শৃঙ্খলা ছিল না। অথবা এই বিশৃঙ্খলতাই তাঁহার প্রতিভাকে সর্ব্বতোমুখী করিয়াছে। বিশৃঙ্খল বলিয়াই তাঁহার প্রতিভা এত শক্তিশালিনী ও সৌন্দর্য্যময়ী। এই দেখি, বঙ্কিম গীতার ব্যাখা লইয়া মস্তক আলোড়িত করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই দেখি, একটি চুট্‌কি গল্প বা 'চোস্ত' রসিকতার অবতারণা করিলেন। আবার হয়ত

পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, অতি গম্ভীর ভাবে গুরুপদে আসীন হইয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অনুশীলন-বাদ (Culture) বুঝাইতে বসিয়াছেন, অথবা কোন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে নিযুক্ত আছেন। গীতার বা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা পড়িয়া যে মুহূর্ত্তে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছি, পর মুহূর্ত্তেই তাঁর প্রতিভার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, প্রতিভার এই এলো-মেলো বিশৃঙ্খল-ভাব খুব বড় কবি ভিন্ন,—বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না।

বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব্বে বঙ্কিমকে একটু ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। কারণ, তাঁহাকে না চিনিলে তাঁহার গ্রন্থগুলি, বিশেষ উপন্যাসাবলী চেনাও কঠিন হইবে। তাই আমরা একটু অধিক বিস্তৃত ভাবে, এতক্ষণ বঙ্কিম সম্বন্ধে নানা কথার

আলোচনা করিলাম। যদি এ আলোচনা সার্থক হইয়া থাকে, তবে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ বুঝিতে, বোধ হয়, আমাদের অধিক কষ্ট হইবে না।

৭ক

বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "সাধনা"য় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থল আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিম বাবু কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলিতেছেন,—

"আমার জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী

লিখিতে হইলে, তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম-প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে, কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতি-গতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলে বেলায় বড় বেশী হ'য়েছিল। বাপ থাকৃতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি। নীতিশিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।"

এমন অকপট ও উদার-প্রকৃতি না হইলে

কি প্রকৃত কবি হইতে পারে? এমন সাফ্ সত্য কথা বলিতে পারে? আজিকার দিনে কয়টা লোক? বঙ্কিম কথায় যেমন, কাব্যেও সেইরূপ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যেখানে যেমন কথাটী প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন,—দেশ, কাল, পাত্র—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা-গুণে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী এত প্রবলরূপে পাঠকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীর তিনটা ভাগ করিলেও, সকল গ্রন্থেই তাঁহার নিজের একটা 'ধাত' দেখিতে পাই। সেই টুকুই তাঁহার বিশেষত্ব, সেইটুকুই বঙ্কিমের নিজস্ব ধন। আজি পর্য্যন্ত কোন লেখক তাহার অনুকরণে সমর্থ হন নাই। সেই নিজস্ব ধন,—অতি গভীর ও গম্ভীর বিষয়ের সহিত তাঁহার সেই "নির্ম্মল,

শুভ্র, সংযত হাস্য।" এমন সুরসিকতা আর কাহার লেখায় দেখিতে, পাও? এক গাদা লেখার সহিত যদি বঙ্কিমের দুই চারিটীও 'বুকুনি' থাকে, বুদ্ধিমান পাঠক তাহা অনায়াসে টানিয়া বাহির করিতে পারেন।

আদর্শ-চরিত্র-সৃজনে বঙ্কিম অদ্বিতীয়। এ বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকও তাঁহার নিকট হারি মানেন। বঙ্কিম হিন্দু কবি; পূর্ব্বজন্মে ও পরকালে তাঁহার বিশ্বাস আছে,—তাই তিনি সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু-রমণীকে সীতা-সাবিত্রীর মত করিতে চান।—সংসারের খুটী নাটী লইয়া চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হয় না। এই সম্বন্ধে গত শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে" একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, "এইজন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি

করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু-কবির চেষ্টা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষ-কারের সহিত যুদ্ধে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু-কবির প্রধান উদ্দেশ্য। * * * কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। * * * পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গ-লতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মত আদর্শ-চরিত্র-চিত্রও বিলাতী নবেলে পাওয়া যায় না।" * লেখক এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য মনস্বী রাস্কিনের "Queen's Garden" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অন্য পরে কা কথা,—

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু-লিখিত 'বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব'। নব্যভারত, দ্বাদশখণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা।

"বিলাতী কবি সেক্সপিয়র বা স্কট্ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টী বিলাতী আদর্শ নারী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র।" লেখক আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, (প্রথম কেন, প্রধান এবং একমাত্র কারণ বলিলেও দোষ হয় কি?) হিন্দুর ধর্ম্মভাব। * * * বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভাবলে তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। * * * শুধু বাঙ্গালায় কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই উপন্যাসগুলি প্রচার হইবে, (আশা করা যায়, সেদিন আসিতে বড় অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগৎ মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সে গুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর যে কথা, আমাদেরও

সেই কথা। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি আমরা এতদূর সম্মানের চক্ষে দেখি। তাঁহার লক্ষ্য বড় উচ্চ, বড় মহান্।—সমগ্র জগৎ যাহার আদর্শ লইয়া চলিতে পারে, প্রতিভাবান্ বঙ্কিম সেইরূপ সার্ব্বজনীন আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, নর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র যে এত উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত, তাহার প্রধান কারণ, নারী-জাতিকে তিনি বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিজেও বলিতেন, "এ দেশের স্ত্রীরাই মানুষ"। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, "বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের আধখানা তাঁহার স্ত্রী"। অর্থাৎ গুণবতী সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গুণা-বলীর আদর্শে তাঁহার অধিকাংশ স্ত্রীচরিত্র প্রস্ফুটিত। শ্রীশ বাবুর "বঙ্কিম-প্রসঙ্গের" সেই ছত্রটিও এখানে পুনরায় উল্লেখ করিতে পারি,—

"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড়। বেশী রকমের—আমার পরিবারের"। বস্তুতঃ নারীজাতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে বঙ্কিম বাবু উপন্যাসে কখনই এমন অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন না। ইউরোপের এমন একদিন গিয়াছে, যখন Knight গণ Chivalric Spirit-এ নারীজাতির প্রতি বিশিষ্ট সম্মান দেখাইতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও সম্মান, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক।

স্ত্রীচরিত্রে তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন। যখন দেবী আঁকিয়াছেন, তখনও যেমন গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন যখন দানবী আঁকিয়াছেন, তখনও সেইরূপ সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল, শ্রী, জয়ন্তী

শান্তি, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্র অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।—এমন সৃষ্টি কেবল প্রকৃতির বিশাল বুকে ও কবির মানসপটেই শোভা পায়। আবার যখন তিনি দানবী হীরা, রোহিণী ও জেব-উন্নিসা—এবং আর এক অংশে কলঙ্কিনী শৈবলিনীকে আঁকিয়াছেন, তখনও সেইরূপ অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইতে এমন 'ওস্তাদী' হাত আর কোথাও দেখি না। "মানব জীবনের কঠোর সমস্যা বিশ্লেষণকেই" বঙ্কিম বাবু উপন্যাস বলিতেন। আমার প্রিয়-সুহৃৎ, সূক্ষ্মদর্শী ও সুলেখক শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সমালোচনা ও বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যায় অতি দক্ষতার সহিত এই কথা প্রমাণ করিতেছেন। * মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি যে প্রেম, সেই অহেতুক

* বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম ও ২য় ভাগ।

অপার্থিব বস্তু লইয়া বঙ্কিম সেই "মানব জীবনের মহা সমস্যা" 'ছকে' আঁকিতেন। এই ছকে তাঁর প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ প্রভৃতি অঙ্কিত। প্রেমে কেহ নিজে পুড়িয়াছেন, কেহ আর এক জনকে পোড়াইয়াছেন।

গল্পের 'প্লট' উদ্ভাবনে বঙ্কিমের তেমন কৃতিত্ব ছিল না, কিন্তু সামান্য ঘটনা লইয়া তিনি যে ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন, কি পাশ্চাত্য কবি আর কি অন্য বঙ্গীয় কবি বা ঔপন্যাসিক, কেহই তাহাতে সমর্থ নহেন। অবশ্য, বঙ্কিমের সকল গল্প Original না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে-যায় না। মহাকবি সেক্সপিয়রও অন্য গ্রন্থ হইতে গল্পের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া নাটকাদি লিখিয়া দিয়াছেন। আর আমাদের 'ভারতের কালিদাস' যে অপূর্ব্ব 'অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থ লিখিয়া জগতের

পূজ্য হইয়া আছেন, তাহার মূলও ত সেই মহাভারত অথবা মতান্তরে "পদ্মপুরাণ।" * আর এই সেদিন মনস্বী শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার-পাঠ্য মহাকবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" গল্পের Origin কোথায়, স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়াছেন।† তাই বলিয়াই কি সেই জগদ্বিখ্যাত কবিকুলের গৌরবহানি ও কবিত্ব "নকড়া-ছকড়া" হইয়া গেল? সেক্সপিয়র বা কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বত্রই পূজিত হইতেছেন, চিরদিনই সেইরূপ পূজা পাইবেন। আসল কথা হইতেছে প্রতিভা, আর সেই প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী কি না?

সাহস করিয়া বলিতে পারি, হাঁ, বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

* শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার-লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ"—জন্মভূমি, ১ম বর্ষ।

† সাহিত্য, চতুর্থ বৎসর, ১৩০০।

৮।

এখন আমরা দেখাইতে চাই, এক উপন্যাসের মধ্যেই আমাদের বঙ্কিম—কবি, দার্শনিক, নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক, নাটককার ও সমালোচক। অতি সংক্ষেপে আমরা এই কথাটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব।

কবি বঙ্কিমের কবিত্ব,—আনন্দমঠের সেই "বন্দে মাতরং" গানটী পাঠ করুন,—

"বন্দে মাতরং।
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
সপ্তকোটি কণ্ঠ-কলকলনিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃর্তখর-করবালে
কে বলে মা তুমি অবলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি'
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।"

এমন গান আজিকার দিনে আর কোন্ কবি গাহিতে পারেন ? বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে ?

পাঠক। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ-শৈবলিনীর সেই "অগাধ জলে সাঁতার" দৃশ্যটী মনে করুন,—

"দুইজনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল-হৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্যঅদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত

কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি। তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি,—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি,—আবার সাঁতার কি?

"প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ"

"শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল, কতকাল পরে। বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা-গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

কবিত্ব কাহাকে বলে, দেখিলে? আ মরি মরি! কি সুর রে!

আরও শুনিবে? তবে শুন। প্রতাপ বলিতেছে, "শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভা-শুভের তুমি দায়ী——

"শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।"

* * * * * *

"শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

"প্র। আমি।

"শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে,—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে,—আমার কি আছে প্রতাপ?

"প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।"

বঙ্কিমের কবিত্বশক্তির বিচারে বোধ হয় আর উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এইবার দার্শনিক বঙ্কিমের একটু পরিচয় লউন,—

'বঙ্কু-কন্তা' ভ্রমরের জীবনরক্ষার্থ নিশাকর ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। * * কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপ-স্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়, সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। * * * আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই

আমাকে এই কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" *

বোধ করি, পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে এই তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে দার্শনিকগণ মস্তক আলোড়িত করিতেছেন।

নীতিবেত্তা বঙ্কিমের একটু পরিচয় গ্রহণ করুন;—

রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিতেছেন,—

"শুন, বৎস চন্দ্রশেখর। যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি

* কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

যে ধর্ম্মাত্মা চন্দ্রশেখর 'আত্মশোণিততুল্য' গ্রন্থাদি দাহ করিয়া গুরুপদে শরণ লইয়াছেন, সেই গুরু তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন। ধর্ম্মবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়াও হৃদয়ে যে ভাব দিতে পারেন না, কবি বঙ্কিম রং ফলাইয়া তাহা কাব্যচিত্রে অতি উজ্জ্বলরূপে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বঙ্কিম তাঁহার নূতনসংস্করণ "রাজসিংহে" ভারতের ইতিহাসের একটী সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। অসঙ্কোচে বলিতে পারি, এই 'রাজসিংহ'ই বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাটককার বঙ্কিম 'সীতারাম'-চিত্রে ও 'পশুপতি'-চরিত্রে অতি সুন্দররূপে নাটকের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

সমালোচক বঙ্কিম "কপালকুণ্ডলা"য় অদৃষ্ট-বাদের কেমন সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন, দেখিবেন।

কবিত্বে, দর্শনে, নীতিউপদেশে, ইতিহাসে, নাটকে ও সমালোচনায় বঙ্কিম কিরূপ শক্তি-মন্ত, পাঠক সে পরিচয় আরও পাইবেন।

বঙ্কিম আত্মজীবনে বুঝিয়াছিলেন এবং কাব্যেও বিধিমতে বুঝাইয়া গিয়াছেন, "সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে—আত্ম-বিসর্জ্জনে।"

'জয়ন্তী'র মুখে পাঠক ইহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেন।

আর একজন চিন্তাশীল ভাবুক এই কথাটা স্থানান্তরে বড় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছেন;—"বাল্মীকিকে স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারাপ্লুত নয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবাদিদেব। আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি

নরাধম, আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব, দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব মানুষকে সমান সুখী করিতে না পারিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনও মানুষের অভিমান আছে। এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মন্! যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা রাখিব, দয়াময়। আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল প্রভু—" *

এমনই "পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বাল্মীকির জয়।'

প্রাণের প্রাণ বলি" দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না বাল্মীকি আদিকবি—মহাকবি?—"রামায়ণের" স্থায় মহাকাব্যের কবি? এমন পরার্থপরতা ছিল বলিয়াই না কবি তাঁহাকে মনুষ্যদেহেই সেই "শঙ্খচক্রধারী মুরারি"র বিরাটমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করাইয়াছেন?

অতি বড় উচ্চ আদর্শ—"পরের মঙ্গল-মন্দিরে প্রাণের প্রাণ বলি" দিতে মহাকবি বঙ্কিম জগতকে ইঙ্গিত করিতেছেন। তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাস হইতেই একথা সপ্রমাণ করা যায়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক্ প্রকারে তাহা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব এবং বোধ করি, বিশেষ আবশ্যকও নাই। পাঠককে বঙ্কিমের উপন্যাস'বলী একটু নির্ব্বিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া এ বিষয় অনুভব করিতে হইবে।

এইবার আমরা তাঁহার উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থগুলির অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

করিয়া দেখাইব, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, আর কি গুণেই তিনি আমাদের এত পূজনীয়!

৩।

বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সকল গুলিতেই এক একটী মহাপুরুষের চরিত্র—গুরুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব শেষ উপন্যাস—'সীতারাম' পর্য্যন্ত এই গুরুর আলোকে উজ্জ্বলীকৃত। গুরু, ইহ-পরকালের একমাত্র সহায়, সংসার-গহনে পথ-প্রদর্শক। হিন্দুর গুরুবাদে বঙ্কিমের আন্তরিক আস্থা ছিল। জাতীয় সাহিত্যে—বিশেষ কাব্য-উপন্যাসে এ জিনিসটী সম্পূর্ণ নূতন।

অদৃষ্টবাদেও বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল। 'কপাল-

কুণ্ডলার' ভবানী পাদপদ্মে বিল্বপত্রদান তাহার অন্যতম নিদর্শন। 'কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই কপালকুণ্ডলাই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য— নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন, তাহা এই প্রকৃতি-পালিতা, স্বভাবসুন্দরীর আদর্শ-চরিত্রে প্রস্ফুটিত। সেই ভীষণ সাগর-উপকূলে, নবকুমারের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই মোহিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর স্বরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কহিল, "পথিক, পথ ভুলিয়াছ ?"

কোথায় এই স্বর, আর কোথায় সেই দুরন্ত কাপালিকের সেই বজ্রকঠোর ধ্বনি ! কিন্তু সেই কঠোরতার মধ্যেও, কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির কেমন কমনীয়তা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

পাঠক, কুলীনপত্নী শ্যামাসুন্দরীর সহিত কপালকুণ্ডলার কথোপকথন একটু শুনুন,—

"শ্যামাসুন্দরী। ভাল, আমার সাধটী পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়েদের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?"

"মৃণ্ময়ী। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

"শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

"মৃ। কেন থাকিব না।

"শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

"মৃ। না।

*   *   *   *   *

মৃণ্ময়ী কিছুতেই গৃহস্থের মেয়েদের মত হইতে চাহে না।

*   *   *   *

"শ্যা। বল দেখি, ফুলটী ফুটিলে কি সুখ?

"ম। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?"

* * * *

সমালোচক বঙ্কিম এই অবসরে একটু সমা-লোচনা করিয়া লইলেন,—"ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ বিতরণই তাহার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল, দ্বিতীয় মূল নাই।"

* * * *

"শ্যা। আচ্ছা—তাই যদি না হইল,—তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?"

"ম। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

দেখিলে পাঠক, প্রকৃতি-পালিতা কপাল-কুণ্ডলার প্রকৃতি! প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গণে যে

বর্দ্ধিত, তাহাকে কি গৃহস্থের মেয়েদের মত ঘরে রাখিতে পার? বন-বিহঙ্গিনী বনে থাকিয়াই সুখী,—তাহাকে সুবর্ণ-পিঞ্জরে পুরিয়া রাজ-ভোগে রাখিলেও কি, সে সুখী হইতে পারে?

পুনশ্চ,—

"শ্যা। এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?

"মৃ। উপায় নাই।"

"শ্যা। তবে করিবে কি?

"মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।

"শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে—তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল কেন?"

এইবার মৃন্ময়ী ভবানী পাদপদ্মে সেই 'ত্রিপত্র' অর্পণের কথা বলিল। মা তাহা গ্রহণ

করেন নাই, তাহাও বলিল। তাই মৃন্ময়ী কহিল, "কপালে কি আছে জানি না।"

"মৃন্ময়ী নীরব হৈতক্ষণ শ্যামাসুন্দরী
শিহরিয়া উঠিলেন

দেখিলেন পাঠক, বাবুর কৌশল ?

এই অপূর্ব্ব বিয়োগান্ত কাব্যেরও আবার Sequel স্বরূপ—"মৃন্ময়ী" বাহির হয়। সে মৃন্ময়ী আবার পুনর্জ্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়া কপাল আর কি। তাই পাঠক ও লেখকের রুচি-প্রবৃত্তি ও বিবেচনা-শক্তি দেখিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়, "কপালকুণ্ডলা"এদেশের অতিঅল্প লোকেই বুঝিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' যে একখানি করুণরসাত্মক অতি অপূর্ব্ব Tragedy, তাহা ত ভবানী পাদপদ্মে বিল্বপত্র দান হইতেই সহজে বোধগম্য হয়।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন

এক হিসাবে কথাটা খাঁটিও বটে। কারণ, 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মুনসিয়ানা ও ভাব-প্রবণতা অতি পরিপাটী বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর এর কোন গ্রন্থ এত সর্ব্বতোভাবে সহিত লিখিত নয়। ঘটনা অতি সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা হইতে কবি যে কি সুন্দর ও অনির্ব্বচনীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে। একদিকে যেমন চরিত্রসৃষ্টি, অপর দিকে আবার তেমনই নীতি-উপদেশ।

মূল চরিত্র ইহাতে তিনটি,—গোবিন্দলাল ভ্রমর ও রোহিণী। প্রেমই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। একদিকে দাম্পত্য প্রেম—অতি মধুর ও পবিত্র, অন্যদিকে রূপজমোহে উন্মত্ততা।—দেবচরিত্র গোবিন্দলাল পাপিষ্ঠা রোহিণীর জন্য সোনার সংসার ছারখার করিল। পতিপ্রাণা, সতীসাধ্বী, ভালবাসার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা

সোণার ভ্রমরের অকাল মৃত্যুর কারণ হইল। অভিমানিনী—পতিপ্রেমে অভিমানিনী—ধর্ম্ম-বলে অভিমানিনী ভ্রমর মরিয়া জুড়াইল।

আমরা এক স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ভ্রমর চরিত্রের একটু আভাস দিব।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে,—দেবতার মন্দিরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে,—ভ্রমরের কপাল পুড়িয়াছে,—এমন সময় গোবিন্দ লালের মাতা কাশীবাসের ইচ্ছা করিলেন। অধঃপতিত গোবিন্দলালও এখন তাই চায়। গোবিন্দলালও মাতার সঙ্গে যাইবে। ভ্রমর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পোড়া কপাল আরও পুড়িতে চলিল।—পাপ রোহিণী যে তাহার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে।

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি চলিলাম।

"ভ্রমর। কবে আসিবে?

"গো। আসিব না।

"ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা,—তোমার দাসানুদাসী,—তোমার কথার ভিখারী,—আসিবে না কেন?

"গো। ইচ্ছা নাই।

"ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

"গো। বুঝি আমার তাও নাই।

"বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল বোধ করিল,—হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল,—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী,—যদি আমি সতী

হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি,—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।”

বড় শক্ত কথা। একদিকে স্বামীর প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালবাসা, অন্যদিকে দারুণ ধর্ম্মের অভিমান,—কতকটা কর্ত্তব্যেরও দায় বটে।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী ?

আর একস্থান দেখ,—ভ্রমর অন্তিম-শয্যায় শায়িতা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্বামীকে দেখিবার

জন্য ভগিনীর নিকট কত আক্ষেপ-অনুতাপ করিতেছিল। * * * এখন সেই ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী?

দুর্জ্জয় অভিমানে, ভ্রমর ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামীকে পত্র লিখিতে 'সেবিকা' পাঠ লিখে নাই। স্বামীর সকল অবস্থাতেই স্ত্রী সেবিকা,—হিন্দুর মেযে ভ্রমর তথাপি 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দুরমণী?

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় "অনন্ত-মুহূর্ত্ত" * নামক একটী অতি অপূর্ব্ব প্রবন্ধে ভ্রমর চরিত্রের

* জিবারা।

সৌন্দর্য্য উপলক্ষ করিয়া একটী অতি অপূর্ব্ব সমালোচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ সমালোচনা আর কেহ করেন নাই। কিন্তু "দুইটী হিন্দু-পত্নী" * শীর্ষক প্রবন্ধে ভ্রমরকে তিনি আদর্শ হিন্দু-রমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঠিক 'আদর্শ' কথাটা লেখা না থাকুক, উদ্দেশ্যটা তাই বটে যে, সূর্য্যমুখীর ন্যায় ভ্রমরও আদর্শ হিন্দু-রমণী। বসুজ মহাশয়ের লেখার আমি একজন পরম ভক্ত হইলেও, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার সহিত এক-মত হইতে পারিলাম না। ভ্রমর যে 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না এবং মৃত্যুকালেও স্বামীকে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—ইহাতে তাহাকে 'আদর্শ হিন্দু-রমণী' বলিব কিরূপে?

তবে মহামতি বেকন বলেন যে, সতী স্ত্রীর একটা দুর্জ্জয় অভিমান থাকা খুব স্বাভাবিক,—

---

* ত্রিধারা।

সে অভিমান ঠিক অভিমান নহে, সতীত্বের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান।

হউক 'সতীত্বের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান'—হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ, ভ্রমর কিছুতেই হইতে পারে না, পারিবেও না। এটা খাঁটী ইউরোপীয় ভাব। সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু রমণীর এ অভিমান না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আদর্শ হিন্দু-রমণীর কথা,—'আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে তোমাকে স্বামী পাই"—অথবা তোমার মত স্বামী পাই।" "জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—হিন্দু রমণী কখন এমন কথা বলিতে পারে না।

তবে বঙ্কিম বাবু যে উদ্দেশ্যে ভ্রমর-চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, এ কথা অম্লানবদনে বলিতে পারি। অর্থাৎ স্ত্রী সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও, এক অভিমানের বিষে.—বিশেষ, সে বিষের প্রভাব

স্বামীকেও অবধি সহিতে হইলে সকলই পণ্ড হয়, সোণার সংসার ছারখার যায়। ভ্রমর যদি একটু নরম হইয়া স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিত, তবে বুঝি সকল দিকই বজায় থাকিত। কিন্তু কবির ত তাহা দেখান' উদ্দেশ্য নয়,—ধন্বন্তরির সুধাভাণ্ডে একটুখানিও বিষ থাকিলে যে কি হয়,—ভ্রমরের দুর্জ্জয় অভিমানে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। ভ্রমর হিন্দু-রমণী—অর্থাৎ আদর্শ হিন্দু-রমণী নহে।

'কৃষ্ণকান্ত উইলের' নতন সংস্করণে বঙ্কিম বাবু গোবিন্দলালকে বাঁচাইয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। পাপীকে একেবারে না মারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া, রহিয়া রহিয়া মারাই যুক্তিযুক্ত।

মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতায় বঙ্কিম মহাপণ্ডিত। অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার এত অধিক যে, তাঁহার যে কোন, উপন্যাসের কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ

—সকল চরিত্রেই তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

"বিষবৃক্ষে"ও বঙ্কিমের কম গুণপনার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। সেই সতী-প্রতিমা সূর্য্যমুখী ও সাধুচরিত্র নগেন্দ্রনাথ চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের অন্তরে জাগরূক থাকিবে। 'বিধবা-বিবাহ' রূপ বিষ যে, পবিত্র হিন্দু-সমাজে স্থান পাইতে পারে না, তাহা সেই কুসুম-কোমল কমনীয় 'কুন্দ' চরিত্রে প্রকটিত। হিন্দু-বিধবার দুঃখে কিরূপে কাঁদিতে ও কাঁদাইতে হয়, তাহা "মুখ ফুটিল" পরিচ্ছেদে কবি বড় মিঠা-হাতে দেখাইয়াছেন। আর, ও-বিষ যে এ দেশের নয়, তাহাও বিধিমতে বুঝাইয়াছেন।

আর সেই আদর্শ হিন্দু-পত্নী সূর্য্যমুখীর পতি-প্রেম ?—সূর্য্যমুখী কমলমণিকে পত্র লিখিতেছেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীকে

লইয়া তুমি সুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি, যেদিন তুমি স্বামীর সুখে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

অ-হ-হ। কি প্রাণঘাতী লিপি। উপবি-লিখিত ঐ ক'য়টীমাত্র কথায় যেন বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়। সূর্য্যমুখী যথার্থই আদর্শ হিন্দুরমণী। তবে যে তিনি দু'দিনের জন্য স্বামীকে ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন,—সেটা অভিমানবশে নয়, ভ্রমরের মত অভিমানিনী বলিয়াও নয়,—সেটা কেবল নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য মাত্র।

আর সেই হতভাগ্য নগেন্দ্রনাথ—যখন নেশার ঘোর কাটিল, রূপের মোহ ঘুচিল, জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল, সূর্য্যমুখীর কল্পিত মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রনাথ উন্মত্তপ্রায় হইলেন। মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া কহিলেন,—* * * "আমি সূর্য্যমুখীর

বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী-কাহার এমন ছিল? * * * আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ!—আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

কি মর্ম্মান্তিক উক্তি! কি মর্ম্মভেদী অনুতাপ! এমন অনুতাপ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন? আর সেই অবসরে অভাগিনী কুন্দ— সেই কাব্য-কাননের প্রেম-পরাজিত কুন্দ—

সেই "না—না" রবে ফুটি-ফুটি-ফোটে-না কুন্দ—
সেই কবির মানসকন্যা কুন্দ মরিয়া জুড়াইল।

পিশাচিনী হীরা ও পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তও যথোপযুক্ত হইয়াছিল। পাপীকে পুড়াইতে, তাহার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর খাক্‌ করিতে বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভব?

নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা ও কুন্দ। প্রকৃতিপালিতা কপাল-কুণ্ডলাকে নির্নিমেষ নয়নে দেখিলে হঠাৎ যেন মনে হয়, সেই ভীষণ দ্বীপ মাঝে স্বভাবসুন্দরী, সবলা মিরন্দা মূর্ত্তি দেখিতেছি! আর কুন্দনন্দিনীর বিরলে সেই "না" পড়িয়া লিয়রের সেই 'কর্ডিলিয়া'র কথা মনে পড়ে। স্কটের আইভান্‌হো-রেবেকার সহিত জগৎসিংহ-আয়েসারও কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহাতেও আমাদের সাহিত্যগুরু উপন্যাসের

সৃষ্টিকর্ত্তা বঙ্কিমের কৃতিত্বের কিছু হানি হয় নাই, হইবেও না। এ কথা আমরা প্লটের Originality সম্বন্ধে একবার বলিয়া আসিয়াছি।

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা; তাই এই দুই উপন্যাসের ভাষা তেমন মনোজ্ঞ নহে এবং কোন কোন স্থলে লিপি-কুশলতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মৃণালিনীতে এ ক্রটী প্রায়ই নাই। উপন্যাসে গানের প্রচলন বঙ্কিম বাবুই প্রথম "মৃণালিনী"তে করেন। ভিখারিণী গিরিজায়ার সেই গানগুলি অতি কোমল, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ।

মৃণালিনী একটী হিন্দুপত্নী। তবে সূর্য্য-মুখীর ন্যায় অত উচ্চশ্রেণীর নহে।—"আমি গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।" মৃণালিনীর এই উক্তিটী বড় সুন্দর।

মনোরমার চিত্রটী বড় মনোহর। দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ পশুপতির পার্শ্বে এই পবিত্র পুষ্পটী বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। স্বদেশভক্ত বঙ্কিম, চিরদিনই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেন। সীতারাম ও রাজসিংহের বীরত্বপনা এবং আনন্দমঠের 'সন্তানধর্ম্মের' প্রবর্ত্তনা তাহার অন্যতম কারণ। যে হিসাবে বঙ্গদর্শনে "ভারত-কলঙ্ক", প্রচারে "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, সেই কারণেই পশুপতি-চরিত্রের অবতারণা। "কেবলমাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল, স্বদেশভক্ত কবি স্বদেশের এ অখ্যাতি সহিতে না পারিয়া বিশ্বাস-ঘাতক, প্রভুদ্রোহী, দুর্ম্মতি-পরায়ণ পশুপতি-চরিত্রের সৃষ্টি করিলেন।" * আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

---

* শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র" দ্বিতীয় ভাগ।

আদর্শ হিন্দু-রমণীর গুটিকত কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইতে চাই যে, স্ত্রী-জাতিকে বঙ্কিম কতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, বিশেষ হিন্দুস্ত্রীকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন।—

"নয়নতারা। দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি ?

"প্রফুল্ল। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনমুখে বলে না।"

আর এক স্থান দেখ,—

"নিশা। শ্রীকৃষ্ণই আমার স্বামী। যিনি সম্পূর্ণ আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না'—কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ,—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

অন্যত্র—

"গৃহধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রী-

জাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগও কঠিন নয়। দেখ, এই এতগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব। *

আর এক স্থান দেখ,—

শান্তির স্বামী জীবানন্দ সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, শান্তিও কত কষ্টে তাঁহার দেখা পাইয়াছে,—কিন্তু যখন সেই সন্তান-ধর্ম্মের নেতা, গুরু সত্যানন্দ জীবানন্দের জীবনের উপর অনেক আশা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহিলেন এবং শান্তিকে সে জন্য অনুরোধও করিলেন,—শান্তি অম্লান-বদনে

* দেবী চৌধুরাণী।

উত্তর দিল,—"আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি,—আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।" *

আরও দেখিবে? শ্রী সীতারামকে উত্তেজিত করিতেছে—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে?" †

বলিয়াছি ত, হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ যত উচ্চ হইতে পারে, বঙ্কিম, তাঁর তাঁহার সকল উপন্যাসেই তাহা দেখাইয়াছেন আবার পুরুষ-চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে বলিতেছেন,—"শুন বৎস। আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য নহে—তুমি শৈবালিনীকে ভাল বাসিতে?"

* আনন্দমঠ।   † সীতারাম।

"সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল,—"কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী। এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি,—আমার এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

এরূপ জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, পরার্থপর, দেব-চরিত্র, হিন্দু-কবি ভিন্ন আর কে আঁকিতে পারে? তাই সমালোচক ও সহৃদয় বঙ্কিম শেষ বলিতেছেন,—"তবে যাও প্রতাপ অনন্ত-ধামে। * * * লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।"

পাপিষ্ঠা শৈবলিনী চরিত্রের সহিত লর্ড টেনিসনের "গুইনিবার" চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য

আছে। কিন্তু সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের অসীম-সহিষ্ণুতা, ও পরার্থপরতা, শৈবলিনীর প্রতি সেই গভীর প্রচ্ছন্ন প্রেম, কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের "সোণার গাছে মুক্তার ফল" বিশেষ। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কেন যে তিনি সৈয়র মুতক্ষরীণের ঝুটা ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।

এখানে প্রতাপ সম্বন্ধে বিশেষ একটা কথা বলিবার আছে। এক দিক হইতে দেখিলে প্রতাপের পরার্থপরতা অতীব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতাপ কি কর্ত্তব্যপরায়ণ? হিন্দু কবি প্রতাপকে আদর্শ চরিত্রের ছকে আঁকিয়া কেন তাহাকে ঘোর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—এবং এক হিসাবে ধর্ম্মভ্রষ্টও বলিতে পারি,—করিলেন কেন? প্রতাপ বিবাহ করিল কেন? যে স্ত্রীর সহিত হিন্দুর জীবনমরণ সম্বন্ধ, যে জন্য স্ত্রী

হিন্দুর সহ-ধর্ম্মিণী , যাহাকে লইয়া হিন্দুর অধ্যাত্ম-জীবন সম্পূর্ণ হয়,—সেই স্ত্রীকে, সেই রূপসীকে ত প্রতাপ একবারও ভাবিল না। যখন কেবল মাত্র শৈবলিনীর মঙ্গলের জন্য এবং চন্দ্রশেখরের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশে প্রতাপ একেবারে ঝাঁপ দিতে গেল, তখনও, সেই শেষ মুহূর্তেও ত একবার ভুলিয়াও স্ত্রীর কথা মনে করিল না।—পরের স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য প্রতাপ আপন চিতা হাতে করিয়া সাজাইল, কিন্তু তার ঘরের স্ত্রীর দশা যে কি হইবে, তাহা একবারও ভাবিল না।—এ হিসাবে কি প্রতাপ কর্ত্তব্যহীন ও ধর্ম্মভ্রষ্ট নহে ?

কবি. অবশ্য প্রতাপের গৃহজীবনের কিছুই উল্লেখ করেন নাই, নাই করুন,—যখন রূপসীর কথা একবার উঠিয়াছে,—রূপসীকে প্রতাপ বিবাহ করিয়াছে, তখন কবি, রূপসী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে সঙ্গতি রক্ষা হইবে

কেন? ভাল, প্রতাপই যাক্;—অমন যে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ রমানন্দ স্বামী,—তিনিও ত প্রতাপকে শেষ আশীর্ব্বাদের সময় রূপসীর কথা একবার উল্লেখও করিলেন না। শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্ম যদি রূপসীকে বিবাহ করা প্রতাপের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ত প্রতাপ অতি স্বার্থপর লোক। হিন্দুর পক্ষে ত স্ত্রী আর একটা "হেলাফেলার" জিনিস নয় যে, খেয়ালবশে স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে? কেন, প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল? ই, এমন বুঝিতাম সাংসারিক কোন গুরুতর প্রতিবন্ধকতার জন্ম,—কিংবা মহাগুরু পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্ম প্রতাপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, রূপসীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা হইলে নয় এক কথা ছিল। সে সব কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না। কবি ইচ্ছা করিলেই বোধ হয় প্রতাপ-জীবনের এই কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিতে পারিতেন।

প্রতাপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাই-
বার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কবি যদি এমনই একটু
কৌশল করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন যে,
রূপসী আর ইহজগতে নাই,—তাহা হইলে
'বন্ধন'হীন প্রতাপের ইচ্ছামৃত্যুতে আমরা কোন
কথাই কহিতাম না। কবি, সেদিকেও এক
কালে নীরব। এমন সকল দিকে নীরব
থাকিলে আদর্শ-চরিত্রে দোষ পড়ে না কি?

তুমি বলিবে, পাঠক বা সমালোচক ত এ
কথা ভাবিয়া লইতে পারেন,—কবি সকল
কৈফিয়ৎ দিবেন কেন?—হাঁ, একটু কৈফিয়ৎ
দিবার কারণ আছে বৈ কি। প্রতাপ যে হিন্দু-
চরিত্র, আর কবিও যে হিন্দু-কবি, তাই, যাহার
সহিত "জীবন-মরণ" সম্বন্ধ, হাড়ে হাড়ে, রক্তে
রক্তে, আত্মায় আত্মায় মিশিয়া, পিতৃলোকের
পিণ্ড প্রয়োজনের জন্য যাহা হইতে 'আত্মজ'
লাভ করিয়া পুরুষ কৃতার্থ হয়, সেই স্ত্রী,

সেই সহধর্ম্মিণীর শুভাশুভ চিন্তার বিষয়ে, কবি এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতাপের মনে এতটুকু তরঙ্গ তুলিলেন না।—মনে-জ্ঞানে ইহা বুঝিয়াও যদি কবির এ ক্রটীর কথা না বলি, তাহা হইলে যে সত্যের অপলাপ করা হয়।

এ ক্রটী সত্বেও কিন্তু, কাব্যাংশে আমরা 'চন্দ্রশেখর'কে বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলি

হিন্দুকবির হস্তে পুণ্যবান ক্ষমাশীল, ধর্ম্মাত্মা চন্দ্রশেখরের কি মধুর চরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মনে-জ্ঞানে সমস্ত জানিয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য—স্ত্রীর প্রতি হিন্দু স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি পালন করিলেন। গুরু রমানন্দ স্বামীর উপদেশ-মত তিনি বিধিমতে শৈবলিনীকে পরীক্ষা করিয়া গৃহে লইলেন।

কিন্তু এই চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও এক অতি উচ্চশ্রেণীর, অতি অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরিত্র

আমরা আর একজন হিন্দু-কবির গ্রন্থে দেখিতে পাই। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, সেরূপ উচ্চশ্রেণীর সম্পূর্ণ আদর্শ চরিত্র এপর্য্যন্ত আর কেহ বাঙ্গালায় অঙ্কিত করেন নাই। বঙ্কিমপ্রসঙ্গে আজ অতি সংক্ষেপে, আমরা সেই চরিত্রটীর একটু আলোচনা করিব।

রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ কমলিনীর স্বামী। কমলিনী ধনীর কন্যা। রূপ, যৌবন, বিলাসিতা—সকলই তাহার বিদ্যমান। কমলিনীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স আট বৎসর মাত্র। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর হিসাবে কিছু অধিক বয়স্ক,—তিনি এই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন। রাধাশ্যাম—পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, উন্নত-হৃদয় ও ধর্ম্মাত্মা। বুঝি ইহাতেও ঠিক তাঁহাকে বুঝা গেল না,—রাধাশ্যাম সংসারে থাকিয়াও যোগি-বিশেষ। প্রকৃত যোগজীবন লাভের ফল—যে সর্ব্বভূতে পরমাত্মা দেবের

সত্তা সন্দর্শন,—তত্ত্বদর্শী রাধাশ্যাম সেই মহা-মহিমময় ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কমলিনীর বিবাহ,—যেন ক্ষীণ-প্রাণা, অতি কোমল মাধবীলতা, অভ্রংলিহ গগনস্পর্শী মহামহীরুহকে বেষ্টন করিল।

কমলিনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা, কাজেই পিতামাতার বড় আদরের ধন। কন্যা পিত্রালয়েই থাকিত। পিতা একজন ডেপুটী, কিন্তু ডেপুটী হইলেও, নানা উপায়ে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা, বিবিধ বিলাস দ্রব্যে গৃহ সজ্জিত, দাস দাসীতে গৃহ পূর্ণ,—কিছুরই অভাব ছিল না। আধুনিক "উচ্চ ধর্ম্মাবলম্বী উন্নত দলের" ন্যায় কমলিনীর পিতার আহার, বিহার, ব্যবহার,—সকলই। তবে কন্যাকে যে বালিকা বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন, সে স্ব-ইচ্ছায় নহে,—পিতা তখন জীবিত ছিলেন,—পিতার ইচ্ছাতেই সে বিবাহ হয়।

পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্র ডেপুটী-বাবু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কাজেই পিতার মান-রক্ষার্থ কন্যাকে সেকেলে আধবুড়ো একটা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের করে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন। যখন তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল, তিনি নিষ্কণ্টকে, আপন ইচ্ছামত চলিতে লাগিলেন। বাধা দিবে কে?

ক্রমে কমলিনী বড় হইল। ডেপুটী-পিতা কন্যাকে 'লেখাপড়া' শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কন্যার স্বতন্ত্র পাঠাগার হইল। চেয়ার টেবিলে গৃহ পূর্ণ।—ইজিচেয়ার, সোফা, খাট, টানাপাখা, বরফজল, বোতলে কি লালরংয়ের ঔষধ—কত দ্রব্যই সে গৃহ মধ্যে বিরাজিত। কমলিনীর বেশ ভূষারই বা পারিপাট্য কি। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়, কমলিনীও প্রতি প্রহরে নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে

থাকেন। কমলিনী শেলি পড়েন, সেক্ষপিয়র পড়েন, বায়রণ পড়েন, কবিতা লিখেন, গান গাহেন, হারমনিয়ম বাজান,—আরও কত-কি করেন। তা ছাড়া তাঁর বন্ধুবান্ধবগণকে চিঠী-লেখা আছে, মাথার অসুখ আছে, হিষ্টিরিয়াও আছে। তাঁহার প্রধান শিক্ষক—শ্রীমান নগেন্দ্র-নাথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ উপাধিধারী যুবা পুরুষ। তিনি সুপুরুষ, সদালাপী এবং 'উন্নতদলের' একজন 'পাণ্ডা' বিশেষ।

কমলিনী তখন অবশ্যই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুবতীর রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল।

কমলিনীর শিক্ষক একজন নন,—অনেক। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা ছাড়া তাঁর বন্ধু-বান্ধবও অনেক।

পাঠক বুঝিয়া লইবেন, কমলিনীর চরিত্র

মলিন হইয়াছিল। কমলিনী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ইহ-কাল, পরকাল, স্বামী, সংসার—সকলই ভুলিয়া প্রতিক্ষণে নূতন নূতন নরকের সৃষ্টি করিত। কবি ইচ্ছা করিয়াই কমলিনী-চরিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

কেন বল দেখি?—একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য আঁকিবেন বলিয়া। চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলোক ও ছায়ার প্রয়োজন, চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষার জন্য সেইরূপ আলোক ও ছায়া—দুয়েরই প্রয়োজন। যেমন কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, অমৃতে গরল, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু,—তেমনই ধর্ম্মের পার্শ্বে পাপ। পাশা-পাশি দুইটী বিপরীত প্রকৃতি না রাখিলে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইবে কেন? সাপের মাথায়ও মণি থাকে,—কমলিনীর স্বামী হইলেন তাই রাধাশ্যাম ভাগবত-ভূষণ। এটা কবির কৌশল মাত্র। অবিকল নরকের 'ফটো' না

তুলিতে পারিলে নরকের প্রতি লোকের ঘৃণা হইবে কেন ? মানুষের যে ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাও ত অনেক সময় স্বার্থের রং দেখিলা।—"পাগল ভগিনী"র কবির প্রতিভা দুর্ভাগা বাঙ্গলা দেশ আজিও ভাল করিয়া বুঝিল না।

রাধাশ্যাম কবির অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে সৃষ্টির ধ্যানে পাঠককে ক্ষণকালের জন্য জগৎ হইতে জগদন্তরে লইয়া যায়,—সংসারের এই অনিত্যতা, এই মিথ্যা মায়া জীবনের এই ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ—সকলই ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইতে হয় কবির রাধাশ্যাম সেই সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মহামাধুর্য্যময় সৃষ্টি। তিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাণ্ড একটা মায়ার খেলা জানিয়া সম্পূর্ণরূপে ইহার প্রতি অনাসক্ত। লোকে তাঁহাকে চিনিত না, বরং পাগল বলিয়া উপহাস করিত।

পাপীয়সী কমলিনীর পাপের আর ইয়ত্তা

ছিল না, অন্তর্দর্শী রাধাশ্যাম সে সকলই জানিতেন,—তবুও তিনি এক নিমিষের তরে বিচলিত হইতেন না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন অচল, অটল ও নির্ব্বিকার, পাপিষ্ঠা পত্নীর সহস্র প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সেইরূপ অচল, অটল ও নির্ব্বিকার। তাঁহার কাছে কমলিনীও যে বস্তু, পথের কুক্কুরীটীও সেই বস্তু।

ব্রাহ্মণের উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত—তাঁহার কাছে সকলেই সমান। ব্রাহ্মণের এ জ্ঞান, পুঁথিগত বা কণ্ঠস্থ নহে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি এই মহাতত্ত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছেন। কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রপাঠ, ভগবানের নাম গান—এই করিয়াই ব্রাহ্মণ দিন অতিবাহিত করেন। রেল গাড়ীতে চড়িয়া ব্রাহ্মণ দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, তখনও মধুর-তানে ভগ-

বানের নাম-গানে মত্ত। চারিদিক মাতাইয়া ব্রাহ্মণ গাহিতেছেন ;—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা
ভূত বিশেষসংঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুর-
গাংশ্চ দিব্যান॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং
সর্ব্বতো নন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি
বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥'

গান গাহিতে গাহিতে ব্রাহ্মণ বাহ্যজ্ঞান-হীন, সংজ্ঞাহীন হইলেন। সেই দেবগান সুধাকণ্ঠে আবার চলিতে লাগিল,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান
সমাহর্ত্তুমিহপ্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপিত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বেযেঽবস্থিতাঃ
প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন
ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং
ভব সব্যসাচিন্‌॥"

সে গীত যে শুনিল, সেই ধন্য হইল। সেই গাড়ীতে অন্যান্য লোকের মধ্যে কমলিনীর শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও কৈলাসচন্দ্র নামক আর এক যুবক ছিলেন। উভয়েই কলঙ্কিনী কমলিনার অনুগ্রহের পাত্র। অন্তর্দর্শী ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিলেন। তাই কথা প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় হাসি মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবুদের চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"কিমত্রহেয়ং—কনকঞ্চ কান্তা
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি ?—নারী।
ত্যাজং সুখং কি ?—রমণী প্রসঙ্গঃ
দ্বারং কি মাহো নরকস্য ?—নারী।

সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা ?—স্ত্রী
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা ?—
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ॥

'কিছু বুঝিলেন কি? ধন এবং স্ত্রী মুক্তি-প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগের যোগ্য। রমণীই জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন। রমণী প্রসঙ্গে যে সুখ, তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। নারীই নরকের দ্বার, স্ত্রীই সুবার ন্যায় মনুষ্যকে উন্মত্ত করে। যাহাকে পিশাচ-রূপিণী রমণী বঞ্চনা করিতে পারে নাই, তিনিই বিজ্ঞ হইতে বিজ্ঞতম।"

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সাধক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপদেশে কৈলাস তেমনই মুগ্ধ হইল। এবার কৈলাস ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পড়িল। ইতিপূর্ব্বে এই উদ্ধত যুবক ব্রাহ্মণকে রীতিমত প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু কৈলাসের প্রতি ব্রাহ্মণের একটু ক্রোধ নাই, বরং ব্রাহ্মণের সেই শান্ত মূর্ত্তি, সেই সরল নির্ম্মল উচ্চ হাস্য

দেখিয়া কৈলাস অধিকতর মুগ্ধ হইল। কিছু আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার প্রতি এত অত্যাচার করিলাম, আপনি রাগ করিলেন না কেন?"

আবার সেই নির্ব্বিকার হাসি। ব্রাহ্মণ উচ্চ হাসি হাসিলেন। বলিলেন "মারিলেই কি লাগে? শিশু সন্তানের দুই একটী দাত উঠিয়াছে,—শিশু মায়ের আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিল। মা হয়ত যাতনায় উহু উহু করিতেছেন তথাচ মায়ের ইচ্ছা, ছেলে যেন আর একবার তাঁহাকে কামড়াইয়া দেয়। তাই বলি, মারিলেই কি লাগে? আর লাগিলেই কি রাগ করিতে হয়? আপনার আঙ্গুল সরু, হাতের বলও কম, —আপনি আজ যে ধাক্কা আমায় দিয়াছিলেন, তাহা ত যৎসামান্য,—বিশেষ আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমেই ঐরূপ কোন না-কোন রকম প্রহার আমি আশাও করিয়াছিলাম। সুতরাং

আপনার প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই—ভ্রুক্ষেপও করি নাই—বরং আমোদ হইল। আমি যখন টোলে পড়িতাম, তখন আমার স্বর্গীয় গুরুদেব আদর করিয়া, আমার পিঠে এক একদিন চাপড় মারিতেন, সে চাপড়ে বোধ হয় আপনি মূর্চ্ছা যান। সে চাপড়ে আমারও শরীর এক একদিন টলিত। কিন্তু তাহাতে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইত, তাহা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে পারি না। ইচ্ছা হইত, প্রতিদিনই তাঁহার নিকট গিয়া সেইরূপ চাপড় খাই।—কৈ, তখন রাগ ত হইত না। উপরন্তু সে প্রহারে আনন্দই হইত।"

ব্রাহ্মণ জীবনটীকে এমন যোগময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাহ্যবিলাসিতার মধ্যে হাসিটা খুবই প্রবল ছিল। সে সবল, সুন্দর, অনির্ব্বচনীয় হাসিতে ব্রাহ্মণের পুণ্যময় পবিত্রহৃদয়

খানি বড় সুন্দর বলিতে, তাঁহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। পরের প্রতি ঘৃণা নাই, সুখের প্রতি আসক্তিও নাই, কর্ত্তব্যও নাই, বাধ্যও নাই, কিছুই নাই, অথচ বাহ্যচক্ষে দেখিলে সকলই আছে।—তাঁহার এক রাজ শিষ্য ছিলেন। সেই রাজা-শিষ্য একবার বড় অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে এক যোড়া মূল্যবান শাল দেন। সেই শাল লইয়া ব্রাহ্মণ এক মহা বিপদে পড়েন। একদিন তিনি শত শত কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজে পরিবেশনাদি করিতেছেন,—এমন সময় শাল লইয়া মহা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে চোর বলিয়া ধৃত হইলেন। তখনও তিনি নির্ব্বিকার, তখনও আনন্দ-চিত্ত। তাঁহার সঙ্গে অনেক কাঙ্গালীরও কয়েদ হয়। এই কাঙ্গালী দলে স্ত্রীলোকও ছিল। বিচারক আদেশ করিলেন,

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই বেত্রদণ্ড ব্যবস্থা হইল। এইবার সেই সংসারনির্লিপ্ত সাধুগণের হৃদয় একটু বিচলিত হইল। —নিজের জন্য সে হৃদয় বিচলিত নয়—নির্দোষ ভিক্ষুক-দল—বিশেষ অবলাকুল কি করিয়া সেই জল্লাদের হস্তে বেত্রাঘাত সহ্য করিবে, তাই ভাবিয়া বিচলিত হইলেন। ভক্তের চিত্ত-বিক্ষেপে গুরুর আসন টলিল। গুরু একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আসিয়া সহাস্য বদনে দেখা দিলেন। বলিলেন, "মন্দভাগ্য! তুমি মিছা শোকে অভিভূত হইতেছ! তোমার হত্যা বে, যে, আমি রক্ষক হইব? * * * ঈশ্বরই একমাত্র গতি! দ্বাদশবর্ষ কাল, তোমার কৃত-কর্মফলের ভোগ আছে। সাবধান!—"

* * * * * *

মুহূর্ত্ত মধ্যে ধর্ম্মাধিকরণে এক অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গেল। "জল্লাদ বেত উঠাইয়া মারিতে

উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, এব বাব হবি হরি বল।—হরি হরি বল।

"হঠাৎ জল্লাদ পড়িয়া গেল। হস্তস্থিত বেত গাছটি ঠিকরাইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাব হাতেব গাঁটে এবং কাঁকালে কে অলক্ষ্যে বিষম প্রহাব করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় লুকাইল। ব্রাহ্মণ ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—

"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ। নমস্তে পুরুষোত্তম!
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্। নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

ভক্তের এ কাতর-আহ্বান ভগবানেব চরণে পঁহুছিল। ভিক্ষুক নরনারীগণের সহিত ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন।

রাধাশ্যামের এ চিত্র অতি অপূর্ব্ব। এমন মহামহিম ধর্ম্মাত্মাব পার্শ্বে, কবি কলঙ্কিনী

কমলিনীকে আঁকিয়া "নব্যবঙ্গের ইতিহাস" সম্পূর্ণ করিয়াছেন। দুঃখ এই, বাঙ্গালী যথাভাবে এ ইতিহাস বুঝে নাই।

ব্রাহ্মণের আর একদিনের একটী মাত্র কাহিনী উল্লেখ করিব। কৈলাসের অন্তিমকাল উপস্থিত; হতভাগ্য কৈলাস, গুরু রাধাশ্যামের উরুদেশে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "হরি বোল হরি বোল" করিতেছে। স্থান—কলিকাতার নিমতলার শ্মশান-ঘাট।

এমন সময় হঠাৎ তথায় এক প্রেতমূর্ত্তি পিশাচিনী অতি দীনভাবে আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। "ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়াছে। মুখে জল দেওয়ায় কিছুক্ষণ পরে তাহার চেতনা হইল।"

পাঠক, এ হতভাগিনী কে বল দেখি? এ সেই পাপিষ্ঠা কমলিনী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। পাপীয়সীর ভিতরে-বাহিরে

নরকের আগুন জ্বলিয়াছে। তাই আজ তাহার এই দশা। কমলিনী বলিল, "আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার স্ত্রী। আমি পাপীয়সা কলঙ্কিনী। আমাকে ছুঁইবেন না। * * * আমার মৃত্যু নিকট,—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনি ক্ষমা না করিলে, আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

"ব্রাহ্মণ। আমি ক্ষমা করিলে যদি তোমার পবিত্রাণ হয়, তবে এখনি ক্ষমা করিলাম।"

আবাব বলি, হিন্দুকবি ভিন্ন, এমন ক্ষমাশীল, উন্নত চরিত্র ও নির্ব্বিকার পুরুষ আর কে আঁকিতে পারে বাধাশ্যাম অতি উচ্চ অঙ্গের আদর্শ হিন্দুচরিত্র। যোগবলে ব্রাহ্মণের চিত্ত এমনই শান্ত, এমনই স্থির। আত্মজ্ঞানে হৃদয় এমনই উদ্বেগশূন্য, এমনই তরঙ্গহীন। তিনি যেন নিয়তই আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি

আপনাতে আপনি অবস্থান করিতেছেন। সংসার তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে কেন?

সাধারণ লোকে 'মডেলভগিনী'র হাসি-মসকরাগুলাই পাঠ করে, এ চরিত্রের রহস্য উন্মোচন করিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। নহিলে এ সামগ্রী আজিকার "শিক্ষিত" দলেই বা উপেক্ষিত হইবে কেন। আমরা রুচিরোগগ্রস্ত হইয়া যথার্থ অনেক ভাল জিনিসকেও দেখিতে জানি না। তাই 'মডেল ভগিনী'-প্রণেতার প্রকৃত প্রতিভা আজিও লোকে বুঝিল না। দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিতাভিমানী 'মডেলভগিনী'র নাম মুখে আনিতেও সঙ্কুচিত হন। সেই দুঃখে কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, 'মডেলভগিনী'র একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। বিশেষ, আমি যে কার্য্যে ব্রতী, লোকের মুখের পানে না চাহিয়া, যথাসত্য প্রকাশ করিতে আমি

ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ-চিত্র যে গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, সহস্র দোষ থাকিলেও, সে গ্রন্থের লেখক জন-সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। এই রাধাশ্যামের চরিত্রে অপূর্ব্ব কবিত্ব, অপূর্ব্ব দর্শন-তত্ত্ব ও অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার পরিচয় আছে। পাপের পার্শ্বে পুণ্যের জ্যোতি ফুটিয়াছে। নরকের পার্শ্বে স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়াছে।—আর আমরা 'মডেলভগিনী'র নামে শিহরিয়া উঠি।

দেখ, এ সংসারে বাস করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন হয় না, এমন জিনিসই নাই;—আবশ্যক হইলে নরকেরও 'ফটো' লইতে হয়। তাই কলঙ্কিনী কমলিনীর 'ফটো' তুলিয়া কবি নিজেই বলিতেছেন,—"আর না। বিদায় দিউন। নরকে নামিবার আর শক্তি নাই। এ নরক অনন্ত দিক্ শূন্য; সীমাশূন্য। গ্রন্থকারই দুর্গন্ধে দিশাহারা,—পাঠক। তাঁহার

সঙ্গে যাইবেন কেমন করিয়া? * * যোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন—হিন্দু সমাজ যেন চিরদিনই হিন্দু-সমাজই থাকে,—ম্লেচ্ছ-স্রোত যেন ফিরিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে যেন অধমের এই অধম গ্রন্থ লোপ পায়।

"কলিযুগের এ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ মরিল না,—রামচন্দ্রই নিহত হইলেন। রাম নিষ্প্রভ, নতশির, রাবণ দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, স্ফীতবক্ষ। গৃহলক্ষ্মী সীতা বহিস্কৃতা, শূন্য সিংহাসনে অসতী অলক্ষ্মী সমাদৃতা। গঙ্গাজল উপেক্ষিত, কূপজল সম্মানিত। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বিদ্রবিত, বিলাসিতা বাহ্যাডম্বর, মূর্খতার একাধিপত্য। শাস্ত্র পদদলিত, অশাস্ত্রে শিরোদেশ সুশোভিত।

"এ সব ভাবিলে অন্তরে কেবল আঁধার দেখিতে হয়। চিন্তাশীলের চক্ষু জলভারে পূর্ণ হয়। হৃদয়বানের বুক ফাটিয়া যায়।"

বুক কাটিয়াছিল বলিয়াই না কবির হাত হইতে নব্য-বঙ্গের এই নিখুঁৎ ফটো বাহির হইয়াছে?

গ্রন্থে লেখকের নাম নাই; তজ্জন্য পাঠক-সমাজে অনেক সময়ে বড় গোল হয়। স্তুতি নিন্দা হয়ত আর একজনকে ভোগ করিতে হয়। বঙ্কিম-প্রসঙ্গে 'মডেলভগিনী'র সমালোচনা করিতে যখন আমি সাহসী হইয়াছি, তখন লেখকের নাম প্রকাশ করিতেই বা সাহসী না হইব কেন? আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় এই 'মডেলভগিনী'র লেখক। 'মডেলভগিনী'র ভাষা, ভাব, আখ্যায়িকা, বর্ণনা—সকলই অতি মনোজ্ঞ। বিশেষ, এ গল্প সম্পূর্ণ Original ও Oriental,—কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থের ছায়া ইহাতে নাই।

'মডেলভগিনী'তে অনেক বিষয়েরই বর্ণনা

আছে। বর্ণনাতে যোগেন্দ্র বাবু সিদ্ধহস্ত। এমন বর্ণনাশক্তি বাঙ্গালায় আর কাহারও নাই। একথা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুও একদিন এই প্রবন্ধ-লেখককে বলিয়াছিলেন গদ্যে যেমন বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পদ্যে তেমনই আর একজনকে দেখিতে পাই রাজকৃষ্ণ রায়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি বস্তুতঃ, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রের গদ্যে বর্ণনা ও কবি রাজকৃষ্ণের পদ্যে বর্ণনা-শক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় অতুল্য।

চন্দ্রশেখরের কথা বলিতে বলিতে রাধাশ্যামকে লইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি চন্দ্রশেখর অবশ্য বঙ্কিমের অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—কিন্তু আর এক অংশে,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে, ধর্ম্মাত্মা ও সংযমীর হিসাবে, লোক-শিক্ষক ও জীবনের-পথপ্রদর্শক হিসাবে রাধাশ্যাম চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অনেক বড়,—'চন্দ্রশেখরের' কবি অপেক্ষা 'রাধাশ্যামের' কবির আদর্শ অনেক

উচ্চ। ইহাতে বঙ্কিমকে ছোট করিলাম, এমন যেন কেহ না ভাবেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, আর যোগেন্দ্রচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র —দুইজনে দুইপথে গিয়াছেন। বিষয় বুঝিয়া ত গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। সেই বিষয়টা কার কত বড়, আর কে কি ভাবে তাহা বুঝিয়াছেন, ভাবুকসমাজে তাহার একটু পরিচয় দিলাম মাত্র। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

প্রাণের সহিত ভালবাসা এক দিকে, আর একদিকে কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান,—বঙ্কিম তাঁহার সকল উপন্যাসেই এই ভাবটী পরিস্ফুট ছেন। "রজনী" হইতে একটী দৃষ্টান্ত দিব,—

"লবঙ্গলতা। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

"আমি। (অমরনাথ) না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য একটুকুও স্থান নাই?

"লবঙ্গ। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।"

এমন কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের শিক্ষা তাঁহার প্রতি পুস্তকেই পাওয়া যায়। অন্তঃপ্রকৃতিতে তুমুল সংগ্রাম প্রদর্শন করানই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য,—শেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় দেখাইতেন। আর পাপীকে যে কিরূপে পোড়াইতেন, তাহা শৈবলিনী-চিত্রে ও পশুপতি চরিত্রে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই পাপীর জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। একস্থানে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।" *

* কৃষ্ণকান্তের উইল।

নারীজাতির উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া, আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?"

বর্ণনায়ও আমাদের বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত।—"আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশ ভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দ মধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপ-রাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল।" *

বঙ্কিম নিজে একজন আস্থাবান্ হিন্দু

* আনন্দমঠ।

ছিলেন বটে, কিন্তু কাব্যে বা উপন্যাসে কখনও কোনরূপ গোঁড়ামী দেখান নাই।

বঙ্কিমের ভাষার তুলনা আর আমি কি দিব?—সমগ্র বাঙ্গালা দেশ তাহার সাক্ষী। বঙ্কিমের ভাষা যেমন "সবলে শোভাময়ী", তেমনই প্রাণময়ী ও মর্ম্মস্পর্শিনী। ইংরাজীতে যাহাকে 'life' বলে, বঙ্কিমের ভাষায় সেইরূপ একটা 'life' দেখিতে পাই। কখন বীণার ঝঙ্কার, কখন পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর রব কখন বা ধূর্জ্জটির ডম্বুরের ধ্বনি,—আ মরি মরি! সে ভাষার কি আর তুলনা আছে? যখন যেমনটী হইতে পারে, হওয়া উচিত, বা হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক যেন প্রাণের তারে সুর মিলিয়া যথাক্রমে সা, রি, গা, মা রূপে কাণের কাছে বাজিতে থাকে। যেন কৃষ্ণের মুরলীরবে যমুনার জল—কল কল ছল ছল করিয়া—নাচিয়া নাচিয়া—ভাবতরঙ্গে লহরীলীলা তুলিতে

থাকে। যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করা যায় ;—

"কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার জন্ম এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল, ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নেবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? * * * বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

"তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।"*

* কমলাকান্তের দপ্তর

এমন প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী করুণ ভাষা ও গানের সুর বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে যিনি দিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আজ তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া আমিও ধন্য হইলাম।

আদর্শমূলক উপন্যাসে (idealistic novels) কবি যেমন সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, সত্যমূলক উপন্যাসে (realistic novels) কিংবা স্থূল ঘটনা মূলক গল্পে (tales) কবির সেরূপ উচ্চপদ পাইবার আশা নাই। তবে যেখানে আদর্শ বা পরাকৃতই প্রকৃত, অথবা 'প্রকৃতই' আদর্শ বা পরাকৃত, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। * সেখানে স্থূলের অনুকরণে মূল, কি মূলের অনুকরণে স্থূল, নির্ণয় করিবার যো নাই। তবে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, ইতিহাস অপেক্ষা প্রকৃত কাব্যগ্রন্থ মানুষের

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত 'উদ্ভট-কথা'।
—নবজীবন, ২য় ও ৩য় বর্ষ।

অধিক উপকারী। ইউরোপীয়দিগের মত হিন্দুর ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এমন নহে,—কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ের ইতিহাস—রামায়ণ মহাভারত যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে, কি ক্ষতি হইত তাহা হিন্দুই বুঝিত।

সৌভাগ্যবশতঃ, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মূলক উপন্যাসের প্রবর্ত্তক গুরু ও শিক্ষাদাতা।

তার পর, বঙ্কিমের উদার প্রেমের একটি খানি পরিচয় দিতেছি। মনোরমার চিত্রে পাঠক সে পরিচয় গ্রহণ করুন।

কবি, প্রণয়ের গতি বুঝাইয়া বলিতেছেন "পাপাসক্তকেও ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ে পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভাল বাসিবে। প্রাণ জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কেন ভালবাসিবে? কিন্তু যে মন্দ, তাকে যে

আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।"

বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্মই এই। সংসারে এ প্রেম একান্ত দুর্লভ। এ প্রেমের কণমাত্রও সংসারে থাকিলে অনেক আগুন নিবিয়া যাইত।

এই মনোরমার চিত্রটী বড় মনোহর।

হিন্দু-স্ত্রীর পতি-ভক্তির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাঠক কিছু পাইয়াছেন, এখন আর একটু গ্রহণ করুন;—

"শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন আবার আমার পুণ্য কি আছে?

"জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

"শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

"জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী,—কেননা তিনি সকলের স্বামী।

"শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না, স্বামীই জানি।

"জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

"শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে" আমার স্বামী-বিরহ দুঃখই আমি ভাল বাসি।

"জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে— তবে ত্যাগ করিলে কেন?

"শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

"শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ব বিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল,—

"তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়,—এত ভাল বাসিলে কিসে ?

"শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস,—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে ?

"জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

"শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্রে ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকুশল ঘটিত। তাহা হইলে এ আগুন জ্বলিত না

কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘসিয়া দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন-ভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া, কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি,—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তারপর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি

"শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।"

স্বদেশভক্ত বঙ্কিম সীতারাম চরিত্রে নাটকের বেশ একটী ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাধুর অধঃপতনে বড় কষ্ট হয়। সীতারামের অধঃপতনে—তাঁহার নৈতিক আধ্যাত্মিক অধঃপতনে আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি। সীতারাম ত ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে,—কবি ইচ্ছা করিলেই ত ইহাকে অন্য ছাঁচে ঢালিতে পারিতেন। আর যদি মুসলমানের জয় দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহারও ত স্বতন্ত্র পথ ছিল। সীতারামকে স্বর্গ হইতে নরকে ফেলিয়া, reactionএর চূড়ান্ত অভিনয় করাইয়া শেষে কবি কেন যে তাহাকে অল্পে অল্পে ছাড়িলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সীতারামের পাপ কি সাধারণ?—যখন সেই মতিচ্ছন্ন, লক্ষ্মীস্বরূপিনী জয়ন্তীকে প্রকাশ্য দরবারে মঞ্চের উপর দাঁড়

করাইয়া চাণ্ডালকে অনুমতি করিল, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

আর জয়ন্তী?—"জয়ন্তী তখন, অপরিম্লান মুখে, জন সমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। * * *"

বল দেখি, এখানে আর কি ভাষা খাটিতে পারে? "তোমাদের মধ্যে যে "সতী-পুত্র" হইবে,"—ঐ এক "সতী-পুত্র" কথাটার মূল্য এখানে কত বল দেখি? যে কথায় হৃদ্‌-তন্ত্রীতে আঘাত পড়িবে, সেই না কথা? এখানে এই "সতী-পুত্র" ছাড়া আর এমন কোন কথা আছে কি, যাহা এমনই ভাবে খাপ্ খাইতে পারে?

এমন ওজন করিয়া কথা বসাইতে সকলে

বড় পারে না। একটীমাত্র কথায় হৃদয় কেমন' ব্যক্ত হইয়াছে! এই একটীমাত্র কথাতে কি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শুনিলাম।

পাঠক, আর এক স্থানে, পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, সুবিশাল গঙ্গাবক্ষে দূরাগত মধুর সঙ্গীতবৎ, আমাদের বঙ্কিমের উচ্ছ্বসিত ভাষার একটু মধুর ঝঙ্কার শুনুন ;—

"* * * দুই শ্রীতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তারপর আর শ্রীর কোন খবর নাই।

"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে. সে কবে সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তাব তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা, এক দিকে

রমা, তার কোথাকার শ্রী'র কেন মনে পড়িবে ? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির-মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে ? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান-বাতির আলো কি মনে পড়ে ? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ— যার এক দিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে ?"

এইরূপ অনেক স্থানে আছে। তাই এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি, বঙ্কিমের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার এক একবার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি-কবিতা পড়িতেছি। আর তাই সে লেখা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতেছে। কূলপ্লাবিনী সৌন্দর্য্য স্রোতস্বতীর সহিত 'ভাব-মন্দাকিনী' মিলিত, বঙ্কিমের ভাষা জলদেবী স্বরূপা হইয়া,

তদুপরি আনন্দে কেলি করিতেছেন। বঙ্গবাসী সে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া মোহিত।

কিন্তু সীতারামের প্রায়শ্চিত্ত কবি বিশেষ কিছু দেখাইলেন না। বলিবে, সীতারামের সর্বনাশ হইল। কিন্তু রাজ্য ত নাশ হইয়াই ছিল;—সীতারামের মনোরাজ্যের ভিতর কি হইল? শেষ কি না—সেই মন্দভাগ্য প্রাণ লইয়া কোথায় পলাইল। কেন, প্রাণটাই কি এত বড়? সীতারাম মরিল না কেন? আর যদি প্রাণ লইয়া বাঁচিয়াই রহিল, তবে কবি তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন না কেন?

সীতারামের পত্নী 'রমা'র চরিত্রের সহিত সেক্সপিয়রের "উইন্‌টারস টেলের" 'হারমিয়নি'র চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

আনন্দমঠে বঙ্কিমের স্বদেশভক্তির পরিচয় পাই বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যানন্দ, জীবানন্দ,

ভবানন্দ, প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের চরিত্র আছে, কবি সে সকল চরিত্রের পূর্ব্ব পরিচয় আমাদিগকে কিছু দেন নাই। অর্থাৎ কি উপায়ে ঐরূপ মহান্ চরিত্র লাভ হইতে পারে, তাহা কিছুই বলেন নাই।—নিজের হাতে না গড়িয়া একেবারে কয়েকটী আদর্শমূলক চরিত্র আমাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এরূপ না করিয়া কবি যদি ঐরূপ চরিত্র কি উপায়ে লাভ হয়, তাহা দেখাইতেন, তবে লোকশিক্ষার পক্ষে উহা বস্তুতই কার্য্যকর হইত। আনন্দমঠের এই ভক্তিবাদ, কালে কবির 'অনুশীলন' বাদ—Culture-এ পরিণত হইয়াছিল।

সমালোচক বঙ্কিমের আর একটু পরিচয় গ্রহণ করুন।—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃদয়পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরি-

কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা, অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে, এ অংশে নিকৃষ্ট। ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।*

অন্যত্র,—

"স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই, ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল

* দেবী চৌধুরাণী।

বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে? পত্নী-বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের মত ভালবাসে,—তাহার কি কষ্ট, কি জীবনসর্ব্বস্ব ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা।"*

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি বঙ্কিমের কিরূপ ভক্তি দেখুন,—

"হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক

* উত্তরচরিতের সমালোচনা।

ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞান-
বেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শ-
নিক তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই
কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশক-
গণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র
বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণকে
এত ভক্তি করিতে শিখাইল। ভারতবর্ষ অল্পকালে
এত উন্নত হইয়াছিল, সমাজ শিক্ষাদাতা-
দিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই
সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

"দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্ম-
ণের হাতে ছিল। কিন্তু হস্তে সে শক্তি থাকিতেও
তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি
ব্যবস্থা করিয়াছেন,—তাঁহারা রাজ্যের অধি-
কারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন
না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক
ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী

নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্য-শ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরীর জন্য বা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষা বৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে, এক মন এক ধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কামধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি

আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্ম নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্ম ব্রাহ্মণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক

কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম মধ্যকালের ইতালী, আধুনিক জর্ম্মণি বা ইংলণ্ড-বাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রোমক ধর্ম্মসমাজ, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিলেন না।" *

বঙ্কিমের এই "অনুশীলনের" ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। অনুশীলনের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে মণিমাণিক্য জ্বলিতেছে।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভগবান বলিয়াই জানি। যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা চলে না।

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলন।

তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা ও সমালোচন সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা।

বঙ্কিমের এই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমার অন্যতম সাহিত্য-বন্ধু, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় "সাহিত্যমঙ্গল" নামে একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বঙ্কিম ভক্তগণকে সেই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বঙ্কিমের হাস্যরসের সহিত বাঙ্গালার আর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির তুলনা করিতে পারি। "ভারত উদ্ধারের" কবি ও সুবিখ্যাত "পঞ্চানন্দ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সরস রসিকতা বাঙ্গালীর এক গৌরবের জিনিস। যে হাসির মূলে অশ্রু, অথবা যে হাস্যরস উপভোগ করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিতে হয়, সে হাস্যরসের অবতারণা করা বড় কম ক্ষমতার কথা নহে। ইন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'ভারত উদ্ধারে' এবং 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরামে'

ইহার ' বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আর 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচু ঠাকুরে' ত কথাই নাই।

ভারত-উদ্ধার বা 'ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায়,' কবি সর্ব্বত্রই হাসাইতে হাসাইতে মধ্যে মধ্যে কেমন কাঁদাইয়াছেন, তাহা দেখুন। কাল-স্রোতের সহিত নদীস্রোতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

"কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি সারি ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে।"

বল দেখি, এই কয়ছত্র পড়িলেই অতীতের

স্মৃতি বুকের ভিতর জাগিয়া উঠে কি না, আর সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটা নিশ্বাস পড়ে কি না?

'ক্ষুদিরাম' নব্যবঙ্গের একটী সুন্দর ছক। ক্ষুদিরাম ইংরেজী পড়িয়া 'উন্নত দলভুক্ত' হইয়াছেন, জাতি ভেদ মানেন না, আচার ব্যবহারের ধার ধারেন না,—কিন্তু তাঁর মা "পদ্মজেলেনী," আজিও সেই পদ্মজেলেনীই আছেন। ক্ষুদিরাম কলিকাতায় কত-কি কীর্ত্তি করিয়া বেড়ান,—অসভ্যা, অশিক্ষিতা, মাছ-বেচুনী মার কথা কি তাঁর মনে পড়ে? দুঃখিনী পদ্ম কিন্তু তার সেই ছত্রিশবন্ধনের সার বন্ধন, সেই আঁতের বস্তু, সেই নাড়ীছেঁড়া-ধনকে দিন রাত্রি ভাবিয়া থাকে। ক্ষুদিরাম বিদেশে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মরও "ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি বিদেশে গিয়াছিল। দুই দিন পদ্ম মাছ বেচিতে গেল না।

"পদ্ম কি ইহাতেই ক্ষান্ত। ডাক-হরকরা যখনই গ্রামে আইসে, পদ্ম তাহার সঙ্গে দেখা

না করিয়া ছাড়ে না। পত্রের প্রত্যাশা পদ্মর ছিল না; পদ্ম জানিত' যে, বড়লোকের এবং ভদ্রলোকেরই পত্র আইসে। তা, নাই বা আসিল পত্র, পত্রবাহক ত আইসে,—সে ত ক্ষুদিরামকে দেখিতে পায়, তাহার কুশল ত বলিতে পারিবে। তাই পদ্ম সেই পত্রবাহকের সহিত দেখা করে, পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কখন বা তিরস্কৃত হয়, কখন পত্রবাহক তাহার পরিতোষের জন্য বলে, 'ভাল আছে',—তাহাতেই পদ্ম স্বর্গ পায়।

'এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি!—দূর কর ছাই। দেখ ত কমলিনী,—আমার চোখে বুঝি কি পড়িল।"

শুধু তোমার চোখে কেন, ব্রাহ্মণ।—এই কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে যে, আমিও চোখে জল রাখিতে পারিলাম না।

কবির কৌশলটা দেখিলে?—ইহারই নাম

না লিপি-কুশলতা? গালগল্প ও হাস্যকৌতুকের মধ্যেও যিনি এমন মর্ম্মান্তিকরূপে কাঁদাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি বড় সাধারণ শক্তি নয়।

বঙ্কিমের "বিবিধ প্রবন্ধ"ও অতি উচ্চশ্রেণীর সন্দর্ভ পুস্তক। ইহাতে তাঁহার নানা বিষয়ক চিন্তা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ আছে। আজিকার দিনে "রামধন পোদ"টী বাঙ্গালীর দেখিবার জিনিস।

কিন্তু এখানে আর একজন মহারথীর নাম উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। বঙ্গ-সাহিত্যে মনস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে। উপস্থিত, তিনি ভাষার একরূপ "কর্ণধার বিশেষ। কালীপ্রসন্ন বাবু চিন্তাশীল, ভাবুক, সুপণ্ডিত ও একজন প্রধান ভাষাবিৎ। ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক করিয়াছেন ও অনেক করিতেছেন। একদিকে যেমন বঙ্কিমের "বঙ্গ-

দর্শন," অন্যদিকে তেমনই ঘোষজ মহাশয়ের "বান্ধব"। সেই সাহিত্য-বান্ধব, সুপ্রসিদ্ধ বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় গভীর গবেষণা পূর্ব্বক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রচুর শব্দ-সম্পদ ও ভাবাবতারণা করিয়াছেন। তদ্বিরচিত "নিভৃতচিন্তা", "প্রভাতচিন্তা" ও "ভ্রান্তিবিনোদ" প্রভৃতি সন্দর্ভ-পুস্তক অতি অপূর্ব্ব। মূল সংস্কৃত বজায় রাখিয়া এবং ব্যাকরণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া তিনি সাহিত্যের সেবা করিতেছেন;—সুতরাং তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম নেতা ও সুহৃদ্,—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, সহৃদয় পাঠক সে বিচার করিবেন।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "আচার প্রবন্ধ", শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর "হিন্দুত্ব" এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র

সবকার মহাশয়ের নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও "নবজীবন" বাঙ্গালীর গৌরবের ধন।

"সাম্য" বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা; ইদানীং তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাই তিনি আর তাহা পুনর্মুদ্রিত করেন নাই মত পরিবর্ত্তনে তিনি অপমান বোধ করিতেন না। "কৃষ্ণ-চরিত্রের" নূতন সংস্করণের ভূমিকায় তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক "কবিতা পুস্তক" বাদে আর সকল গ্রন্থ এত উৎকৃষ্ট ও উচ্চশ্রেণীর যে, বঙ্কিম ভিন্ন ঠিক-ওরূপ আর কেহ লিখিতে পারেন না। কিন্তু ঐ 'কবিতাপুস্তকে'ও "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক যে কবিতাটী আছে, তাহা অতি সুন্দর। অবশ্য "ইন্দিরা", "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী" প্রভৃতি ছোট গল্প এবং চুট্‌কি লেখা গুলির কথা এখানে তুলনীয় নহে।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী

বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা তুলনা করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয় রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত রহিয়াছে।"*

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায়, সহৃদয় পাঠকই এখন সে বিচার করুন।

আর কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক হইতে দেখিলে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র গঠন, কি রচনা-নৈপুণ্য, কি লিপি-কুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং কি ঘটনা-সামঞ্জস্য,—সকল বিষয়েই, আমাদের বঙ্কিম উপন্যাস-জগতে রাজরাজেশ্বর! বঙ্কিমের

* সাধনা।

এই শূন্য সিংহাসনে আবার বসে কাহার অধিষ্ঠান হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।

১০।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ধর্ম্ম ও গ্রন্থসমূহের ফলাফল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব।

সাহিত্য ধর্ম্মে বঙ্কিমের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। প্রাণের পিপাসায় তিনি সাহিত্যধর্ম্মের সেবা করিতেন। তাহাতে কৃত্রিমতা ও কপটতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি যখনই কিছু সত্য, সুন্দর ও সার বুঝিতেন,—মুক্তকণ্ঠে নির্ভীক-চিত্তে তাহা পরিব্যক্ত করিতেন। সাধারণ-মতকে পদতলে রাখিয়া সর্ব্ব সময়েই তিনি সকলের এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করিতেন। স্তুতি-নিন্দা তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। তাঁহার কথাই ছিল এই, 'পাবলিক-

মতের উপর কখন আত্মনির্ভর করিতে নাই।' কতবার তিনি কথা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ-লেখককে উপদেশ দিয়াছেন,—"যদি এ জগতে কিছু করিতে চাও, তবে কিছুতেই পাবলিকের পানে তাকাইও না। পাবলিকের পানে তাকাইলে পাবলিককেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, জগতেরও কিছু করিতে পারিবে না।"

কেহ কেহ বলেন, "কবির জীবনে আবার বিশেষ কার্য্য কি? কবি হৃদয়ে প্রতিভা অবশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের অভাব। প্রতিভা নিষ্ক্রিয়, প্রেম কার্য্যশীল।" কিন্তু কথাটা কি ঠিক? প্রতিভা ও প্রেম কি স্বতন্ত্র বস্তু? আর স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও কি ছু'য়ে খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই? * বিরুদ্ধবাদী বলিলেন, "প্রতিভা খড়-জোর কাগজে-কলমে একটা কোন-কিছুর

* লেখক-প্রণীত "প্রতিভা ও প্রেম"।
—নব্যভারত, ১০ম খণ্ড।

স্বাভাবিক চিত্র আঁকিতে পারে, প্রেম কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট নহে,—সে সেই কোন-কিছুর একটা কাজ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কথাটা abstract form-এ না বলিয়া একটা concrete form-এ বুঝা ভাল।

মনে কর, কোন এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।—প্রতিভাবান্ কবি বড়-জোর তখন সেই দুর্ভিক্ষের একখানি নিখুঁৎ 'ফটো' তুলিয়া জন-সাধারণের চক্ষে ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তিনি প্রাণের টানে তখনই সেই দুর্ভিক্ষ স্থলে উপস্থিত হইয়া, আপন অবস্থানুযায়ী সেই বুভুক্ষু নর-নারীগণকে এক এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া যথার্থ মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলেন। বিরুদ্ধবাদী বোধ হয়, এই-বার বড়-গলা করিয়া বলিতে পারিবেন,—"এখন এই দু'য়ের মধ্যে প্রকৃত কাজ করিল কে ?

আমার মনে হইতেছে, ঠিক এই কথা লইয়া একদিন আমার সহিত একজন প্রতিভাবান্ কবির কথোপকথন হয়। অবশ্য, আমরা দুই জনেই এক-মতাবলম্বী ছিলাম। কবি-ভ্রাত বলিলেন, "দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতা যে অতীব প্রশংসনীয়, তাহার আর কথা কি? কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও যদি সেই সময়োচিত একটী অতি স্বাভাবিক-চিত্র তাঁহার কোমল কবিত্ব-তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহাও বড় কম প্রশংসার কথা নহে। কারণ, প্রেমিকের প্রেমাশ্রু বা কার্য্যতৎপরতা তাঁহার ব্যক্তিগত নিজস্ব ধন, কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির অশ্রু তাঁহার একার সম্পত্তি নহে,—সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী সেই অশ্রুর দাবী করিতে পারে। কারণ, দেশস্থ যাবতীয় নরনারীর উত্তপ্ত অশ্রু লইয়া সেই চিত্রখানি অঙ্কিত।"

কথাটার বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। তবে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, সেই প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতার পরিতৃপ্তি, তাঁহার আত্ম-জীবনেই সমাহিত হইতে পারে,—বড়-জোর তাঁহার বংশপরম্পরা ঐ কীর্ত্তির মন্দিরে আরোহণ করিতে পারেন ;—কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির সেই মর্ম্মোদ্ঘাটিত, সদ্য-অশ্রুবিকশিত দুর্ভিক্ষের চিত্রখানি সভ্য মনুষ্য-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে থাকিবে।

অতএব প্রতিভাও যে নিষ্ক্রিয় নহে, তাহা আমরা সংক্ষেপে একরূপ প্রতিপন্ন করিলাম।

"যে খাটে সেও যেমন কাজ করে, আর যে ভাবে সেও একরূপে কাজ করে"—এই সোজা কথাটা, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করিতে নারাজ।

কোন কোন সামাজিকের মুখে সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, বঙ্কিমকর্ত্তৃক দেশের কোন উপকার হওয়া দূরে থাক,—ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। হিঁদুর ছেলে-মেয়েরা নাকি তৎ-প্রণীত উপন্যাসাবলীর নায়ক-নায়িকার চিত্র দেখিয়া আচারভ্রষ্ট ও কলুষিত-চরিত্র হইতেছে। তা ছাড়া, ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় কথার আলো-চনা করিয়া বঙ্কিম হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত দিয়া-ছেন।—তবে আর তিনি দেশের কাজ করিলেন কি?—তাঁকে লইয়া তোমরা অত হৈ চৈ কর কেন?

কথাটা বিজ্ঞের মুখে বলিতে ও শুনিতে বেশ। কিন্তু এ শ্রেণীর সামাজিক বা সাহিত্য সেবী বিজ্ঞগণ কি বঙ্কিমকে একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? প্রতিভার কার্য্য কি, কবির আদর্শ কি, তাহা কি তাঁহারা কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পূর্ব্বেই আমরা এক স্থলে কবির

আদর্শের সহিত রামধনুর 'তুলনা করিয়াছি, এবং ইহাও বলিয়াছি, কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়া কবি জন্মগ্রহণ করেন না,—সুদূর ভবিষ্যতের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য থাকে, এবং সেই লক্ষ্য সাধনোদ্দেশ্যে, ইহজীবনে তিনি অশ্রান্ত শ্রম ও কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করেন। প্রকৃত প্রতিভার কার্য্যই এই।

অতএব সব দিক্ না দেখিয়া, খামকা যাঁহারা বঙ্কিমের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়াই বিবেচনা করি। তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য, কি তোমার সমাজের নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য, অথবা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তোমার ছেলে-মেয়ে উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া, কবি ত তাঁহার আদর্শকে খাটো করিতে পারেন না। জীবনে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি ধরাবক্ষে বিচরণ করেন,—ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে,—

যখনই তিনি তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখনই অমনি সিংহবিক্রমে, কাহাকেও দৃক্‌পাত না করিয়া সেই প্রতিভাবান পুরুষসিংহ আত্ম-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখেন। মহামহিমময়ী, মহা তেজস্বিনী এই প্রতিভার মান যদি অহঙ্কার হয়, তবে এ অহঙ্কারকে পূজা করিতেও আমরা প্রস্তুত। মহামনস্বী কার্লাইল এই প্রতিভা-পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার "Hero-Worship" নামক অপূর্ব্বগ্রন্থে "বীর-কবির" পূজার বিধি আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও একজন মহা বীরপুরুষ।

তবে বলিবে, বঙ্কিম আর 'হাতে কলমে" দেশের কি করিয়া গিয়াছেন? উত্তরে আমরা বলি, একজন ফিলসফার সারাটা জীবন ঘরে দ্বার দিয়া বসিয়া থাকিয়া, দর্শন-তত্ত্বের একটা কূটমীমাংসা স্থির করিয়া একরূপ ভাবিতে

ভাবিতেই মরিয়া গেল,—আর একজন পাহাড়ী-কুলি বিপুল-পরিশ্রমে পাহাড় কাটিয়া রেলপথ বসাইল ;—এই দু'য়ের মধ্যেই বা কে "হাতে কলমে" অধিক কাজ করিল,—ভাল তুমিই বল ?

তাই বলিতেছিলাম, 'কর্ম্মযোগী বঙ্কিম' সারাটা জীবন উৎকট পরিশ্রমে সাহিত্য-ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ঐকান্তিক গবেষণা ও আজীবন অনুশীলনের ফল—সুকুমার সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যেন হরি-হর মিলন। ইতিপূর্ব্বে, আর কাহারও দ্বারা সাহিত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি 'প্রচারে' স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে ? একটী তৃণে বা একটী মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল

আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে ?”

বস্তুতঃ, বঙ্কিমের এই সাহিত্য-সেবা, তাঁহার মহামহিমময় ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, তদ্বিরচিত গ্রন্থাবলীও সেই মহালোকে আলোকিত।